জোছনাকুমারী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BanglaBook.org

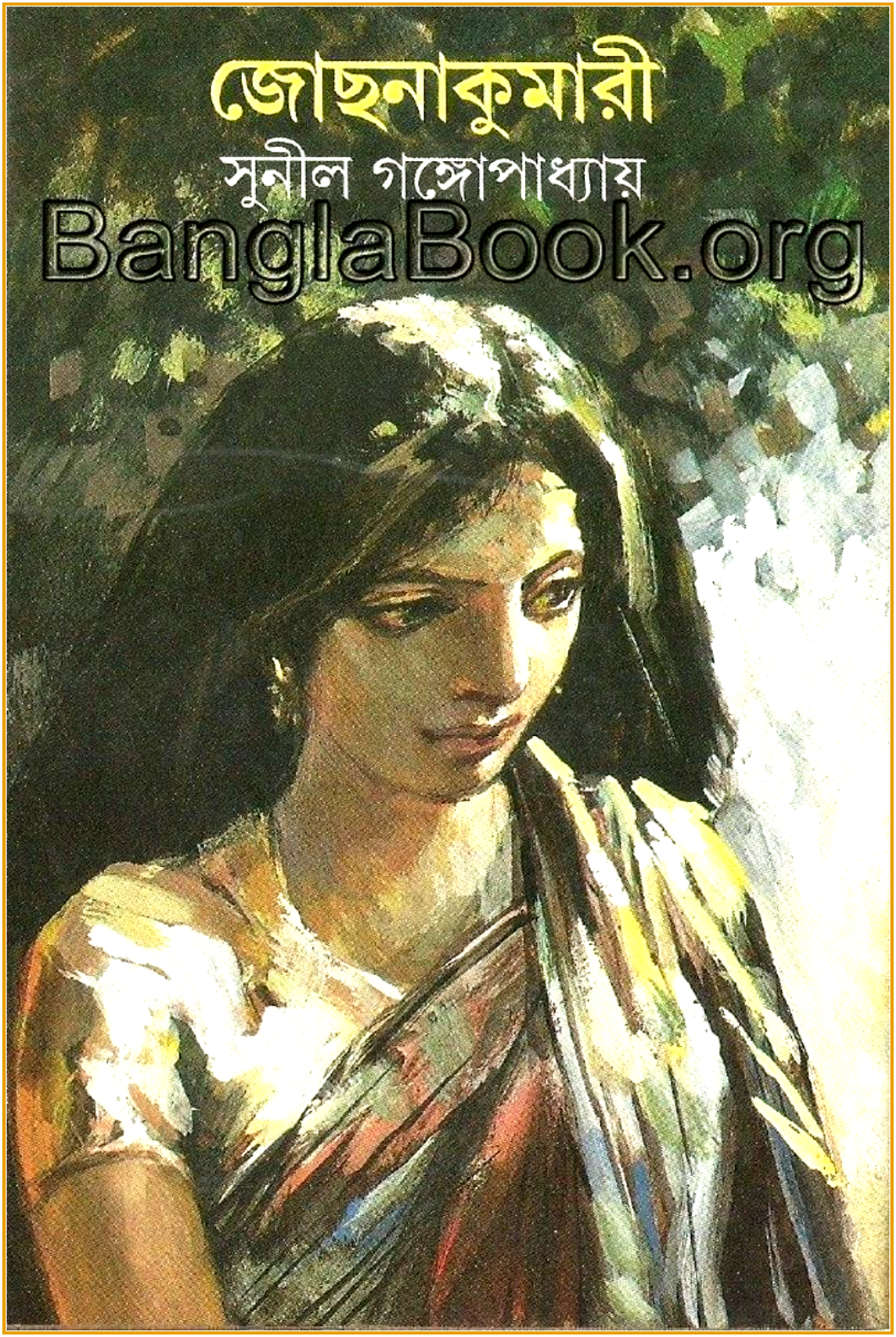

www.BanglaBook.org

জোছনাকুমারী কি সত্যিই এক
ডাইনি, যাকে কেন্দ্র করে
অদ্ভুত সব গল্প ছড়িয়ে আছে
সীমান্তগ্রাম গড়বন্দীপুরের এ-প্রান্ত
থেকে ও-প্রান্তে ?
জোছনাকুমারী কি দ্বৈতসত্তাময়ী এক
বাস্তব যুবতী, যে বীণা হয়েও ফতিমা,
হিন্দু হয়েও মুসলমান ?
জোছনাকুমারী কি কবিগানের এক
কাল্পনিক নায়িকা, যার নামে পালাগান
বাঁধে প্রেমিক কবিয়াল, আর সে-গান
শোনাতে গেলে চোখের জলে গলা
যায় বুজে ?
জোছনাকুমারী কি সত্যিই এক
জোছনাকুমারী ? মায়া দিয়ে গড়া যার
শরীর, যাকে ধরতে-ছুঁতে পারে না
কেউ ? মাঝেমাঝে মানুষের মধ্যে
নেমে এসে সে পরীক্ষা করে মানুষের
স্নেহ-মমতা-দয়া আর ভালোবাসা,
আর প্রতিবারই ফিরে যায় দুই চক্ষে
অশ্রু নিয়ে ?
দুই বাংলার সীমান্তবর্তী এক গ্রামের
পটভূমিকায় এক অসাধারণ
জীবনকাহিনী শুনিয়েছেন
'পূর্ব-পশ্চিম'-এর স্রষ্টা । মানুষের
তৈরি মানচিত্র যে কত কৃত্রিম, দুই
বাংলার মানুষের
হাসি-কান্না-কাম-লোভ যে অভিন্ন,
খড়ির দাগের দু-প্রান্তেই যে অবিচ্ছেদ্য
জীবনপ্রবাহ ছড়ানো, আরও একবার
তুলে ধরলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই
হৃদয়স্পর্শী উপন্যাসে ।

www.BanglaBook.org

জন্ম : ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) ফরিদপুর, বাংলাদেশ শিক্ষা কলকাতায় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ । টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু । তারপর নানা অভিজ্ঞতা । বীমা কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেনি, ইউনেস্কোর বয়স্ক শিক্ষা প্রচারের কর্মী, সরকারী অফিসের করণিক, অধুনালুপ্ত একটি দৈনিক সংবাদপত্রের বিভাগীয় সম্পাদক । বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত । প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে । 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন একসময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন । প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ' । শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত । প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন' । ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা । আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার । ১৯৮৫-তে পান সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার । ছদ্মনাম 'নীললোহিত' । আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়' ।
'পূর্ব-পশ্চিম' গ্রন্থের জন্য দ্বিতীয়বার আনন্দ পুরস্কার, ১৩৯৫ সালে ।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

জোছনাকুমারী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

www.BanglaBook.org

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৬ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪০০ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৬৬০০
তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

© সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7066-205-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০.০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

জোছনাকুমারী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

শোনেন শোনেন বাবুগণ শোনেন দিয়া মন
আমাদের গড়বন্দীপুরের যতেক বিবরণ
আহা শোনেন দিয়া মন !
জয় জয় বোম ভোলা, জয় জয় বোম ভোলা....
প্রথম শোনেন বটবৃক্ষের অতি গুপ্তকথা
প্যাঁচা আর প্যাঁচানী শুধু জানে সে বারতা
আহা অতি গুপ্তকথা
বটবৃক্ষের তলে একদিন ফুটিল জোছ্ছনা
রাত্তির নয়, আন্ধার নয়, দিনের মুছ্ছনা
আহা ফুটিল জোছ্ছনা
জয় জয় বোম ভোলা, জয় জয় বোম ভোলা.....

ঠা-ঠা করছে রোদ, ধূ ধূ করছে মাঠ, তিন রাস্তার মোড়ে আকাশী বটতলায় গুপী যন্ত্র বাজিয়ে গান ধরেছে বাবাজী। মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার চুল চূড়ো করে গিঁট বাঁধা, গান গাওয়ার সময় সে এমন একখানা ভাবের সঙ্গে তাকাচ্ছে যে তাকে বেশ বাউল বাউল দেখায়। আসলে সে একজন রিকশাওয়ালা। তার প্রাণকেষ্ট নামটা বদলে লোকে এখন তাকে বাবাজী বলে ডাকে, কারণ সে গেরুয়া রঙের লুঙ্গি পরে।

কিছু চিন্তা করতে গেলেই বাবাজীর চোখ ট্যারা হয়ে যায়। সে একখানা বিড়ি ধরিয়ে গানের পরবর্তী লাইনগুলো মনে মনে ভাবতে লাগলো।

একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছে টিকিস টিকিস করে, বসবার জায়গাটার দু'দিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা। ধুলো উড়িয়ে একটা লরি এসে গোরুর গাড়িটার পেছনে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ভেপু বাজাতে লাগলো, তাতে বাবাজীর গেল সুর কেটে। গুপী যন্ত্রটা বাজাতে বাজাতে সে এবার তার দু'টো কানই দিল সেদিকে।

পরের লাইনটা মনে পড়তেই তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। বেশ একখানা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ছবি আঁকার মতন হাসি।

কালো কেশে বিজ্‌লি খেলে চক্ষে ঝরে পানি
কার ঘরনী কার বা কইন্যা কিছুই না জানি
আহা চক্ষে ঝরে পানি

সুর করে গাইবার পর কিন্তু লাইনদুটো তার পছন্দ হলো না। কোথায় যেন গোলমাল আছে, এর আগে কিছু একটা থাকা দরকার ছিল। এ জন্য সে দোষ দিল লরিওয়ালাকে, ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকালো একবার।

এবার সে চোখ বুঁজে গানটা মেরামত করতে লাগলো। চোখ বুজলে বদ শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু অনেক কিছু দেখা যায়। সে যেন বটবৃক্ষের তলায় তার গীতের নায়িকাকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

মিনিট দশেক বাদে আর একটি শব্দ পেয়ে তাকে চোখ খুলতে হলো। গোরুর গাড়ি ও লরিটি চলে গেছে, কিন্তু একখানা সাইকেল রিকশাভ্যান দাঁড়িয়ে পড়েছে তার কাছেই। দু'বার ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজলো। রীতিমতন আঁতকে উঠলো বাবাজী। ত্রিলোচন এসে গেছে!

হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তোলা, পুরনো মাগুর মাছের মতন গায়ের রং, ছেঁড়া গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে জবজবে, মাথায় বাঁধা তেল চিটচিটে গামছা, ত্রিলোচন প্যাডেলে পা দিয়ে গভীর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাবাজীর দিকে।

বাবাজী বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললো, কী গো, আড়াইটের ট্রেন এর মধ্যে পার হয়ে গেল?

ত্রিলোচন প্রথমে নীচু গলায় বললো, যাবে না কি তোর বাপের জন্য বসে থাকবে?

তারপর গলা চড়িয়ে বললো, শালা, শেত্‌লাতলায় আমি তোকে খুঁজে মরছি, আর তুই এখানে ঘুমোচ্ছিস?

ত্রিলোচনের ধমকে একটুও বিচলিত না হয়ে, কিশোরী মেয়ের মতন লাজুক হেসে বাবাজী বললো, ঘুমোচ্ছি না রে, গান বাঁধছি একখান!

মাথা থেকে গামছাখানা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে ত্রিলোচন বললো, তোর গানের আমি ইয়ে মারি। ট্রেন ডেড় ঘণ্টা লেট, যা ইস্টেশানে যা!

বাবাজী যেন খানিকটা স্বস্তি পেয়ে বললো, ওঃ, ডেড় ঘণ্টা লেট, তবে তো অনেক দেরি। আয় তিলু, বোস একটুখানি, খানিকটে বাঁধা হয়ে গেছে, শুনবি?

ত্রিলোচন সাইকেল রিকশা থেকে নেমে এসে খেলাচ্ছলে বাবাজীর কোমরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচে বেশ জোরে ক্যাঁৎ করে একটা লাথি কষিয়ে বললো, শালা, গান শুনলে পেট ভরবে ? বাড়িতে এক গুষ্ঠির পিণ্ডি চটকানো হবে কী দিয়ে ?

বাবাজী অর্থাৎ গেরুয়াধারী প্রাণকেষ্ট লাথি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো বটে কিন্তু বাঁ হাতের গুপীযন্ত্রটি উঁচু করে তুলে ধরে একটুক্ষণ থেমে রইলো এবং চিরাচরিত গ্রাম্য গায়কের দৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরেই সে ঘুরে গিয়ে নীচু হয়ে দুদুম দুম দুদুম দুদুম ইত্যাকার শব্দ করে দু'পাক নেচে গান ধরলো,

বটবৃক্ষের তলে একদিন ফুটিল জোছ্‌ছনা
রাত্তির নয় আন্ধার নয় দিনের মুছছোনা
আহা ফুটিল জোছ্‌ছনা....
একা একা কে আসিলে কে তুমি ললনা
কে তোমারে দুঃখ দিল, কে করে ছলনা
আহা কে তুমি ললনা ?

হঠাৎ আবার গান থামিয়ে সে আবেগে শ্লেষ্মা মেশানো গলায় বললো, ওরে তিলু, তোর মনে আছে, কোন অচেনা দেশ গাঁ থেকে এক জীয়ন্ত জোছ্‌ছনা যেদিন ঐ বটগাছতলায় এসে....

দু'জনেই একবার বটগাছের ওপরের দিকে তাকালো। যেন বটগাছটি সব কথা শুনছে।

বাবাজীর এই গানের ছুতোয় কিন্তু ত্রিলোচন একটুও গলেনি। তার কাছে ঘড়ি নেই, ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে সেটার দু'দিকে ফুঁ দিয়ে ত্রিলোচন বললো, তিনটে বাজতে চললো, তুই কাজে যাবি, না এখানে বসে মখরাবাজি করবি ?

বাবাজী লুঙ্গিটায় কষে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বললো, যাচ্ছি রে বাবা, যাচ্ছি। ট্রেনের টাইমে ঠিক পৌঁছে গেলেই তো হলো ? তার আগে আর প্যাসেঞ্জার কোথায় ? শোন, হেকিমপুরে এই পোষ মাসে নাকি গাওন-বাজনের মেলা হইচ্ছে, তুই শুনিছিস কিছু ?

তিলু একটা ছোটখাটো রাক্ষসের মতন মুখভঙ্গি করে বললো, আরে ধুর, তোর ঐ হেকিমপুরের ইয়ে মারি। তুই যা তো শালা !

বাবাজী বললো, কেতু আমারে বইল্লে, এবারে নাকি জবর মেলা হবে। গরমেন্ট ঢোল দিয়েছে। পল্লীগ্রামের আর্টিসদের ডেইকেছে, খাওন-থাকন দিবে,

www.BanglaBook.org

রেল ভাড়া দিবে।

—তুই কাজ-কর্ম ছেইড়ে মেলায় ফূর্তি করতে যাবি ?

—তুই আর আমি যাবো। গান গাবো। হ্যাঁ, তা ফূর্তিও হবে বটে। রাহা-খরচ ছাড়াও পঁচিশ টাকা করে দিবে নাকি, গরমেন্টের ফিস।

—তোর ঐ পঁচিশ টাকার আমি ইয়ে মারি। হেকিমপুরে যাওয়া আসা দুই দিন, তার জন্য পঁচিশ টাকা। রোজগার বন্ধ। যতসব ভূতের ব্যাগার। আরে এ সুম্মুন্ধির পুত, তুই আজ রিকশা নিয়ে যাবি, না লখাইকে ডাকবো !

—মেলায় কত লোক গান শুইনবে, বাবুরা আইসবে

—তোর ঐ বাবুদের আমি....

ত্রিলোচনের শরীরটা এখনও ঘামে সপসপে। সে যখন খুবই পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত থাকে, তখন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তার ধর্ষণযোগ্য মনে হয়। তার শরীর শুধু এই কথাটা বলার সময়েই চেতিয়ে ওঠে।

বাবাজী বুঝতে পারলো, এখন ত্রিলোচনের সঙ্গে এইসব উচ্চাঙ্গের আলাপ জমবে না। হেকিমপুরের মেলার এখনো দিন পনেরো দেরি আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কিন্তু গান বাঁধার মতন আমেজময় ব্যাপার ছেড়ে এই গনগনে রোদে কি কারুর রিকশা চালাতে ভালো লাগে ? ঐ কাজটা বাবাজীর কোনো সময়েই ভালো লাগে না, কিন্তু পোড়া পেটের জন্য দুটো ভাত আর কিসে জুটবে ?

বাবাজীর বউ মারা গেছে সাত বছর আগে, কিন্তু মাত্র মাস ছয়েক হলো সে একদিন মনের খেয়ালে একটা কোড়া লুঙ্গি গেরুয়া রঙে ছাপিয়ে নিল। চুল-দাড়ি কাটারও আর হাঙ্গামা নেই। তবে, তার কাজের গাফিলতি দেখলে ত্রিলোচন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, সাধু সেজেছিস, রেকশা চালাতে যদি তোর মানে লাগে, তা হলে ভিক্ষে করগে যা না ! বেশি পয়সা পাবি !

এই কথাটা শুনলেই বাবাজী কুঁকড়ে যায়। আর যাই হোক, সে কখনো ভিক্ষে করতে পারবে না। তা হলে বাপ-পিতামহরা ওপর থেকে অভিশাপ দেবে না ? নিজে হাজার রকম ভাবে কণ্টক শয্যায় শুতে বাধ্য হলেও বাপ-পিতামহর আত্মার অপমান করা চলে না।

তবু যেতে পা সরছে না। এ লাইনের ট্রেন একবার লেট করতে শুরু করলে আর থামে না। আড়াইটের ট্রেন পাঁচটাতেও আসবে কি না সন্দেহ। আজ এ-বেলায় একটা প্যাসেঞ্জার পেলেও বুঝতে হবে বড় ভাগ্য।

শরীর মুচড়ে কাকুতি-মিনতি করে সে বললো, তিলু, গানটা যতখানি বেঁধেছি,

www.BanglaBook.org

তুই পুরোটা একবারটি শুনবি নি ? শেষমেষ যদি ভুলে যাই ? তুই একবার শুনলেই আমি নিশ্চিন্দি। ভগবান তোরে যে ক্ষ্যামতা দিয়েছেন····

তাকে থামিয়ে দিয়ে ত্রিলোচন বললো, চোপ !

বাবাজী বললো, তিলু, তুই যদি গলাখানা খুলতিস, এ তল্লাটে আর কোন্ শালার ব্যাটা শালা

ত্রিলোচন এবার কাছে এসে বাবাজীর মাথার ঝুঁটি চেপে ধরে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো, ফের যদি ঐ কথা বলবি তো আমি তোকেই একদিন···· । কথার সঙ্গে লাথিও চলতে থাকে।

বাবাজী তবু হাসে। ত্রিলোচনের ওপর রাগ করা যায় না। বউটা মরে যাবার কিছুদিন পরে বেশ অনেকদিন যখন বাবাজী ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগলো, তখন ত্রিলোচনই তো তাকে খেতে পরতে দিয়েছিল। ত্রিলোচন নিজে এই রিকশাখানার মালিক, তবু সে হাফ-শেয়ারে বাবাজীকে একবেলা চালাতে দেয়, এ কী কম কথা হলো ? যে-গরু দুধ দেয়, সে মাঝে মাঝে পা চাঁটা দেবে না ? ছোটবেলা থেকেই ত্রিলোচন তাকে এরকম মারে, অথচ ত্রিলোচনের মতন বন্ধুও অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়।

আরও অন্তত যাতে পাঁচ মিনিট সময় কাটানো যায়, সেই লোভে বাবাজী বললো, ছাড়, এবার গেলুম বলে ! অন্তত একটা বিড়ি দে। আজ ক'টা খেপ মারলি ?

—সকাল থেকে একটাও ট্রেন আসেনি, প্যাসেঞ্জার কি আকাশ থেকে পড়বে ?

এইবার বোঝা গেল ত্রিলোচনের মেজাজ খারাপ থাকার আসল কারণ। খাটতে সে অরাজি নয়, রোজই তো খাটে, কিন্তু ছ কিলোমিটার দূরে রেল স্টেশান পর্যন্ত সে এই গরমে যাওয়া-আসা করেছে, কোনো রোজগার হয়নি। হাটবার না হলে রেলের প্যাসেঞ্জার ছাড়া এখানে কে আর রিকশায় উঠবে ?

ত্রিলোচন বাবাজীকে একটা বিড়ি অবশ্য দিল। দিয়ে বললো, যা ভাগ !

বাবাজী বুঝলো, ত্রিলোচনকে আর বেশি ঘাঁটাতে গেলে আরও মার খেতে হবে। তবু সে খনখনে গলায় আপন মনে বললো, জোছ্ছনা কুমারীর গানটা ভুলে না যাই····

সাইকেল ভ্যানটার দিকে এগিয়ে যাবার সময় প্রকাশ পেল যে বাবাজীর বাঁ পাটা ল্যাংরা। সকলের ধারণা, তার জন্ম থেকেই ঐ রকম। বাবাজী অবশ্য এর

www.BanglaBook.org

ঘোরতর প্রতিবাদ করে। সে যাই হোক, ঐ খুঁতো পা নিয়ে তার রিকশা চালাতে অসুবিধে হয় না। ডান পায়ে বেশি জোর দিয়ে প্যাডল করে। বাঁ পাটা শুধু ছুঁইয়ে রাখে।

ছায়াতে বসে গামছার হাওয়া খেয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হলো ত্রিলোচন।

বাবাজী গুপী যন্তরটা ফেলে গেছে। তা তো যাবেই, রিকশা চালাতে চালাতে সে তো আর যন্তর বাজিয়ে গান গাইতে পারে না। সীটের তলার বাক্সটাতে রেখে দিতে পারতো অবশ্য, কিন্তু সে বোধহয় ইচ্ছে করেই ওটা ত্রিলোচনের সামনে রেখে গেল।

বসে রইলো কেন ত্রিলোচন, এখন তো তার বাড়ির দিকে দৌড়োবার কথা। নদী পেরিয়ে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে লেবুপাতা-কাসুন্দি দিয়ে এক কাঁসি পান্তাভাত খেয়ে গণ্ডারের মতন ঘুমোবে। ত্রিলোচন কিংবা তার বউ জ্যামনি কেউই অবশ্য গণ্ডার কখনো স্বচক্ষে দেখেনি, গণ্ডারেরা ঘুমের জন্য বিখ্যাত কি না তাও তারা জানে না, তবু তাদের পরিবারে গণ্ডারের ঘুম কথাটা খুব চলে।

নদী মানে অবশ্য দু বিঘতের ব্যাপার, শীতকালে হাঁটু ডোবে না। এই গ্রীষ্মকালেও খেয়া মাঝির তোয়াক্কা করতে হয় না, একখানা ডিঙ্গি নৌকো বাঁধা থাকে, দড়ি ধরে ধরে এপার ওপার করা যায়। কতদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, ঐ নদীর ওপর একটা ব্রীজ হবে, ওপারের দুটো মন্দিরের জোড়া শিব খুব জাগ্রত, বছরে একবার, চৈত্রের গাজনে বেশ পেল্লায় মেলা বসে, তা ছাড়া ঐ দিক দিয়ে আর একটা নতুন রাস্তা হয়েছে বাংলাদেশের বর্ডারের দিকে। একটা ব্রীজ থাকলে ত্রিলোচনের মতন সাইকেল রিকশাওয়ালাদের রোজগার তিন গুণ হয়ে যেত! কিন্তু তাকি ঐ হিংসুটে শালারা করবে?

ত্রিলোচনের পেটে দাউ দাউ করে জ্বলছে খিদে। অন্য দিন সে এই সময় বাবাজীকে রিকশাখানা গছিয়ে দিয়েই তিন লাফে বাড়িতে পৌঁছে যায়। আজ তবু সে গেল না। খিদেটাও একটা নেশা। সারা শরীরে খিদের টং টং শব্দ হচ্ছে। তার বউ হা-পিত্যেশ করে বাজপাখির মতন ধারালো চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকবে। তা থাক না। মেয়ে মানুষদের মাঝে মাঝে বঁড়শীর ফাৎনার মতন টোঙানো ভালো।

তা ছাড়া বাড়ি ফেরার মুখ নেই আজ ত্রিলোচনের, তার ট্যাকে পয়সা নেই।

বাবাজীর গুপী যন্তরটা তুলে নিয়ে সে দু'একবার অন্যমনস্কভাবে পিড়িং পিড়িং করলো।

www.BanglaBook.org

বাবাজী যে খানিকটা গান শুনিয়ে গেল তা মনে করবার চেষ্টা করলো ত্রিলোচন। সাধারণত তার মনে থেকে যায়।

প্রথম শোনেন বটবৃক্ষের অতি গুপ্ত কথা
প্যাঁচা আর প্যাঁচানী শুধু জানে সে বারতা
আহা অতি গুপ্ত কথা
বটবৃক্ষের তলে একদিন ফুটিল জোছ্ছনা
রাত্তির নয় আন্ধার নয় দিনের মুছ্ছনা
আহা ফুটিল জোছ্ছনা...

খুব আস্তে চাপা গলায় গাইছে সে। ছেঁড়া গেঞ্জি পরা, রুক্ষ চেহারার দুর্মুখ এই রিক্সা চালকটি ঐ ভেকধারী, দাড়িওয়ালা বাবাজীর চেয়ে অনেক ভালো গায়ক-বাজনাদার। তার একটা স্বাভাবিক সুর জ্ঞান আছে। কোনোদিন শেখেনি, তবু সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিতে পারে। তবে সে সহসা অন্যদের সামনে গলা খোলে না। তার বাবার নিষেধ।

বুড়ো মনোহর সাঁতরার কথা এখন সবাই ভুলে গেছে। তা সে মারাই তো গেছে সাত-আট বছর হয়ে গেল। এক সময় এই মনোহর ছিল এ তল্লাটের নাম করা দাঁড়া-কবি, রজব আলি শেখের এক নম্বর শিষ্য। যৌবনে তার মুখে খই ফোটার মতন পদ্য আসতো, দেশ বিদেশের কত কবিয়ালদের সঙ্গে সে মুখে মুখে লড়াই করে টেক্কা দিয়ে ইনাম পেয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতেও সে গান গেয়ে এসেছিল একবার।

ক্ষয় কাশ হয়েছিল মনোহরের। শেষ দুটো বছর সে একেবারে জীবন্ত মড়া হয়ে ছিল, তার নাতি বিষ্টু তার বুকের পাঁজরাগুলো গুণতো। ত্রিলোচনের হাত ধরে সে বারবার বলে গেছে, বাপধন, তোদের জন্য আমি জমি-জিরেত কিছু রেখে যেতে পারলুমনি রে। ভগবান শরীর দিয়েছে গায়ে খেটে খাবি। কিন্তু কখনো আমার মতন গানের লাইনে যাস না। এখন ঘোর কলি, এখন কেউ আর ওসবে কান দেয় না। ওরে, কাশতে কাশতে যেদিন আমার গান বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন আসরের মানুষ হেসেছিল। হেসেছিল রে, হেসেছিল! আমার ওস্তাদ রজব আলি শেখ, মা সরস্বতী তার জেহ্বায় ভর করতো। তারে মেরে তাড়িয়ে দিল পাকিস্তানে। এই ঘোর কলিকালে মানুষ আর মানুষ নাই!

ছোটবেলায় বাপের অত বাধ্য ছিল না ত্রিলোচন, লুকিয়ে লুকিয়ে অষ্টকের দলে গান গাইতে যেত। মৎস্যকন্যা পালায় সে রাজার গান গাইতো। একবার

www.BanglaBook.org

হরিরামপুরের সারা রাত্রব্যাপী মচ্ছবে তারা ডাক পেয়েছিল। দু'জন রেডিও আর্টিস্টও সেখানে গান করবে। ত্রিলোচনদের দল যখন স্টেজে আসার সুযোগ পেল, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দশ-বারো জনের বেশী শ্রোতা নেই, তাও তাদের মধ্যে অর্ধেকই গড়াগড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সেই দিন ত্রিলোচন তার বাবার দুঃখের কথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

এই যে বাবাজী জোছ্ছনার সঙ্গে মুছ্ছনার মিল দিয়েছে, এটাও তো মনোহরের কাছ থেকে নেওয়া। বাবাজী মুছ্ছনার কী বোঝে ? মনোহরের রামায়ণ – মহাভারত কণ্ঠস্থ ছিল, বাবাজী তার কতটুকু জানে ?

পেটের মধ্যে খিদে মোচড়াচ্ছে, তবু ত্রিলোচনের এখন গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

জোছ্না কুমারী। জোছ্না কুমারী ! কে যে প্রথম এই নাম দিয়েছিল তার ঠিক নেই, তবে গ্রামের অনেক মানুষ এখনো সেই মেয়েটার কথা বলাবলি করে।

ত্রিলোচন অবশ্য মনে করে, পুরো গল্পটাই একটা গুজব। জোছ্না কুমারীকে কেউ নিজের চক্ষে দেখেনি। সবাই পরের মুখে ঝাল খায়। একজনের কাছ থেকে শুনে আর একজন বেশী রং চড়ায়।

বটগাছের গুঁড়ি থেকে একটা টিকটিকি চারবার ডেকে উঠলো। কোনো কথা বলার সময় কিংবা চিন্তা করতে করতে টিকটিকির ডাক শুনলে সেটা নাকি সত্যি হয় !

এতক্ষণে একবার হাওয়া দিল, শর শর করে উঠলো বটগাছের পাতাগুলো। একঝাঁক ছাতারে পাখি ঝগড়া করতে করতে খসে পড়লো মাটিতে। এই নিঝঝুম দুপুরে ধারে কাছে আর কোনো মানুষ নেই, ত্রিলোচনের গা একবার ছমছম করে উঠলো।

তবু জোছ্নাকুমারীর কাহিনীটা তার বিশ্বাস হয় না।

এইরকম এক দুপুরে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা নাকি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এই বটগাছতলায়। তার শরীরখানি অগ্নিবর্ণ, চক্ষু দুটি টানা টানা, ভ্রমরকৃষ্ণ চুল একেবারে পায়ের গোছ পর্যন্ত। এমন এক রূপবতী কন্যা এই পচা-ধচা গড়বন্দীপুরে আসতে যাবে কেন ?

তবু সে এসেছিল, এমন এক নিঝঝুম দুপুরে একা একা এইখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

সে কি কোনো পথ হারানো বড় ঘরের মেয়ে ? নাকি কোনো অপদেবতা ?

www.BanglaBook.org

তারপর সে কোথায় গেল তা কেউ জানে না, কিন্তু সে দিন থেকে সতীশ আর বলাই নামে দু'জন জোয়ান ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দু'জন কেন ? সুন্দরী যুবতীর টানে যদি ঘর ছাড়তেই হয়, তবে কেউ কি তার খেলুড়ে বন্ধুকেও ডেকে নেয় ? সতীশ আর বলাই এক সঙ্গে উধাও হয়েছে তা ঠিক, তাদের লাশও উদ্ধার হয়নি। থানা-পুলিস পর্যন্ত করা হয়েছিল তাদের জন্য। সতীশ আর বলাই অন্য কোনো কারণে ষড় করে শহর-বাজারে ভেগে পড়তে পারে, সেটা বিচিত্র কিছু নয়, তা বলে কি তারা বাপ-মায়ের একবার খোঁজ নিতেও আসবে না ?

সে যাই হোক, ঐ সতীশ আর বলাইয়ের নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে জোছনাকুমারীর নামটা জুড়ে গেছে।

ঐ দু'জন উধাও হবার পরেও দেড় বছর বাদে একবার জোছনাকুমারীকে দেখা গিয়েছিল নদীর ঘাটে, খেয়া নৌকোয় সে একা একা বসে অঝোরে কাঁদছিল। শুধু গোষ্ঠবিহারী তাকে দেখে চেঁচিয়ে মাত করেছিল সারা গ্রাম। অবশ্য ঐ গোষ্ঠবিহারীটা একেবারে দাগী মিথ্যেবাদী, ফেরেববাজ, তার ওপরে গাঁজাখোর। জোছনাকুমারীকে যদি সে দেখেই থাকে, তা হলে সে নিরুদ্দেশ হলো না কেন ? বেটা নিমকহারাম।

গোষ্ঠবিহারীর চিৎকারে অন্য কেউ আসবার আগেই সেই অপরূপ কন্যা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল, তখন ভরা বর্ষা, নদীতে অনেক জল। দু'দিন পরে সাহাপুরের বাঁকে ভেসে উঠলো একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোকের মড়া দেহ, তাকে কেউ চেনে না বটে কিন্তু এমনই হেঁজিপেঁজি চেহারা যে সে কখনো জোছনাকুমারী হতেই পারে না।

গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে এক সময় বেশ ভাব ছিল ত্রিলোচনের। কৌতূহলবশে সে বারবার জিজ্ঞেস করেছে, হ্যাঁরে গুষ্ঠে, তুই সেই মেয়েডারে কামন দেখেছিলি সত্যি করে বল তো। কী করে বুইঝলি যে সে-ই জোছনাকুমারী ? শিবমন্দিরে পুজো দিতে কত বেওয়া মেয়েছেলেই তো নদীর ঘাটে আসে ?

তা গোষ্ঠবিহারীর পেট থেকে কি কথা বার করবার উপায় আছে ? সে শুধু মিটিমিটি হাসে। হঠাৎ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে বলে, আহা-হা দেখিছি না, বুক একেবারে ঝলসে গেছে। যে না দেখেছে, সে কিছুই বুইঝবে না রে ! সতীশ আর বলাই তো ঐ রূপের আগুনেই পুড়ে মলো ! আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি যে আমি...

এরপর আরও কয়েকবার দেখা গেছে সেই স্ত্রীলোককে, দিনে কিংবা রাতে, কোনো গাছতলায় একাকী দাঁড়িয়ে কাঁদে। মানুষ দেখলেই চক্ষের নিমেষে

www.BanglaBook.org

মিলিয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েরাও নাকি তাকে দেখতে পেয়েছে। তবে সতীশ আর বলাইয়ের নিরুদ্দেশ হবার মতন কিছু আর ঘটেনি।

নাঃ, আর বসে থাকা যায় না। ত্রিলোচন এবার উঠে দাঁড়ালো। পুরুষমানুষ রোজগার করতে বেরিয়েও যদি খালি হাতে ফেরে, তবে তার বিড়ম্বনা অন্য কে আর বুঝবে ? আজ একটাও ট্রেন আসেনি, সে কি ত্রিলোচনের দোষ ? জ্যামনি যদি চোপা করতে আসে তা হলে আজ তার কপালে মার আছে !

সারা জীবন গান গেয়ে আর কবির লড়াই করে কাটিয়েছে মনোহর সাঁতরা, অভাবের সময় জমি বিক্রি করেছে। এখন বসত বাড়িখানা ছাড়া ত্রিলোচনের এক ফোঁটাও জমি নেই। একটা দিন রোজগার বন্ধ হলেই চক্ষে অন্ধকার দেখতে হয়। তার শরীরখানা বেশ শক্ত পোক্ত, সহজে রোগভোগ হয় না।

মাঠ ভেঙে নদীর দিকে যেতে গিয়েও ত্রিলোচন থমকে দাঁড়ালো। বর্ডারের দিক থেকে কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। এই দিনেদুপুরে ?

এই বটগাছটার ডান পাশ দিয়ে যে সোজা রাস্তা, সেটা অনেক বছর ধরে অকেজো হয়ে গেছে। ওদিকে যাওয়া নিষেধ। পায়ে হেঁটে যদি বা যেতে পারো, রিকশা চলবে না। চেকপোস্টের পাঁচশো গজের মধ্যে কেউ গিয়ে পড়লে ফোর্সের লোকেরা গুলি চালিয়ে দিতে পারে। এরকম নাকি হুকুম আছে।

তবু কি কেউ যায় না, তা যায়। ওদিকের জিনিস এদিকে আসে, এদিকের জিনিস ওদিকে যায়, মানুষের হাত দিয়েই তো সে সব মালামাল পাচার হয়। এখন এদিক থেকে খুব গোরু এস্‌মাগলিং হচ্ছে ওদিকে, ওদিক থেকে আসছে সুপুরি, কৌটোর দুধ, পুরোনো জামা-কাপড়। মাঝে মাঝে দলে দলে শুধু মানুষও আসে, আর ফিরতে চায় না। কিন্তু সে সব তো রাত্তিরবেলা।

প্রথমে ত্রিলোচন ভাবলো লটকা। চেকপোস্টের সেপাইদের জন্য ত্রিলোচনদের গ্রামেরই আঠেরো-উনিশ বছরের ছেলে লটকা ফাইফরমাস খাটে, রান্না করে দেয়। লটকা অত জোরে ছুটছে কেন ? জবরদস্ত কোনো খবর আছে নাকি ?

খুব সাদা রঙের রোদ্দুর হলে অনেক সময় দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায়। তাই ত্রিলোচন প্রথম বুঝতেই পারেনি যে ছুটন্ত মানুষটি একটি শাড়ী পরা স্ত্রীলোক।

ত্রিলোচনের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হলো।

ভালো করে বৃষ্টি হয়নি বলে এখনো মাঠে ধান রোওয়া হয়নি। খাঁ খাঁ করছে

www.BanglaBook.org

চারদিক। স্ত্রীলোকটি মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো আবার, কিন্তু এবার হাঁটতে লাগলো টলে টলে। চোখ তুলে সে একবার দেখে নিল বটগাছটা।

দুটো লোক সাইকেলে পাশাপাশি চলে গেল রাস্তা দিয়ে, তারা কেউ মেয়েটির দিকে ফিরেও তাকালো না। ওরা কি দেখতে পায়নি, ত্রিলোচন একাই দেখছে। চোখের ভুল নয় তো?

কস্তা ডুরে শাড়ী পরা স্ত্রীলোকটি মাঠ ভেঙে এসে উঠলো উঁচু রাস্তায়। তারপর বটগাছটার দিকে সোজা এসে ঘাড় ঘুরিয়ে চার পাশটা দেখে নিল। ত্রিলোচনকে সে গ্রাহ্যও করলো না। বটগাছটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে দু'হাতে মুখ চাপা দিল, তারপর কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বটগাছের কোনো কোটর থেকে খ্যার-র-র, খ্যা-র-র-র করে ডেকে উঠলো একটা প্যাঁচা!

ত্রিলোচনের শুধু যে চোখ দুটোই বিস্ফারিত হয়ে গেল তাই-ই নয়, মুখটাও খানিকটা হাঁ হয়ে গেল। তাহলে এই-ই কি সেই? দিনের বেলায় জোছনাকুমারী? গায়ের রং আগুনবর্ণ কি না কে জানে, কিন্তু বামুন বাড়ির মেয়েদের মতন মাজা মাজা। এই কন্যার বয়েস বেশী না, কুড়ি-বাইশ হবে, পাতলার ওপর গড়ন, হ্যাঁ, চুলও আছে অনেক।

জোছনাকুমারীর কথা যারাই বলেছে, তারা সবাই তাকে কাঁদতে দেখেছে। ডাকিনীরা ঐরকম কান্না দিয়েই পুরুষকে টানে। দুনিয়ায় এমন কোন্ পুরুষ আছে যে মেয়েদের কান্না দেখলেও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে? মেয়েমানুষ ছুরি-ছোরা চালাতে জানে না কিন্তু যখন তখন চোখের জলের অস্ত্র দিয়ে জিতে যায়।

ত্রিলোচনের একবার ইচ্ছে হলো টেনে চোঁ চাঁ দৌড় মারতে। পরক্ষণেই সে নিজেকে ধমকালো। সে কি সতীশ কিংবা বলাই? সে ত্রিলোচন, সে তিন ছেলেমেয়ের বাপ, জ্যামনির মতন একখানা দজ্জাল বউ রয়েছে তার, সে তাকেও ভয় খায় না, ভয় পাবে একটা ছিপছিপে অচেনা মেয়েকে?

ভাত খাবার পর যে বিড়িটা টানবে বলে সে জমিয়ে রেখেছিল, উত্তেজনার মাথায় সে সেই শেষ বিড়িটাও ধরিয়ে ফেললো।

মেয়েটা কেঁদে কেঁদে কী যেন বলছে গুঙিয়ে গুঙিয়ে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ত্রিলোচন এবার ভালো করে দেখলো, এই অলৌকিক কন্যার দু'পায়ে কাদা

www.BanglaBook.org

মাথা, চুলেও কাদা, তার শাড়ীতে কাদার সঙ্গে যেন শুকনো রক্ত মিশে আছে মনে হলো।

হঠাৎ কি অন্ধকার হয়ে এলো আকাশ ? গুড় গুড় করে মেঘ ডাকলো। এই একটু আগেও আকাশ ছিল নিরেট, কোথা থেকে এত তাড়াতাড়ি ছুটে এলো মেঘ ? জোরে জোরে বাতাস বইছে। বটগাছের ডালপালা কেঁপে কেঁপে উঠছে, একসঙ্গে অনেক পাখ-পাখালি চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। সব লক্ষণই যেন মিলে যাচ্ছে।

তবুও ত্রিলোচন চলে গেল না, বিড়ি টানতে টানতে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ওগো বাছা, তুমি কে ?

মেয়েটি মুখ থেকে হাত সরালো।

ওরে বাবা, এ কী চোখ ! এমন দৃষ্টি তো সাধারণ মানুষের হতে পারে না ? চোখ দুটো থেকে কালী পুজোর তারাবাতির মতন জ্যান্ত আগুন ঝিলিক মারছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, সেই নিঃশ্বাসেও আগুনের হল্‌কা ! ভুরুতে কঠিন রাগের ভঙ্গি করে সে তাকিয়ে রইলো ত্রিলোচনের দিকে।

ত্রিলোচন ভাবলো, এবারে এই ডাকিনী কি সতীশ আর বলাইয়ের মতন তাকেও খেয়ে ফেলবে ? আজ কোনো প্যাসেঞ্জার জুটবে না জেনেও কেন সে বাবাজীকে জোর করে পাঠালো ? জ্যামনি তার ভাত বেড়ে বসে আছে, ত্রিলোচন আজ রোজগার করেনি বলে কি নিজের বাড়িতে ফেরার অধিকারও হারিয়েছিল ? এতক্ষণে তার এক ঘুম হয়ে যেত !

রমণীটি তার দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতন ত্রিলোচনও চোখ ফেরাতে পারছে না।

এই বটগাছটা তার কতকালের চেনা। ন্যাংটো বয়েসে ত্রিলোচন এখানে এসে খেলা করেছে। কিছুদিন এখানে এক সাধু আস্তানা গেড়েছিল, ত্রিলোচন সেই সাধুকে একদিন একটা দেশলাই দিয়েছিল এমনি এমনি। কতদিন প্রবল বৃষ্টিতে ত্রিলোচন এখানে আশ্রয় নিয়েছে, এই বটগাছ তাকে একটুও সাহায্য করবে না ?

হঠাৎ ত্রিলোচন মন থেকে সব ভয় তাড়িয়ে দিল। ফটফটে দিনের আলোয় কোন্ অপদেবতা তাকে ধরবে ? ধরলেই হলো ! অন্ধকার না হলে ওদের শক্তি থাকে না। সে একটা জোয়ান মানুষ, সে শুধু শুধু এত ঘাবড়াচ্ছে কেন ? দেখাই যাক না কী হয়।

ত্রিলোচন আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই সেই মেয়েটি অদ্ভুত

www.BanglaBook.org

ফ্যাসফেসে গলায় বললো, তুই আমারে খাবি ?

ত্রিলোচন আবার কেঁপে উঠলো। এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন ! কে কাকে খাবে ? কবিয়াল মনোহর সাঁতরার ছেলে সে ত্রিলোচন রিকশাওয়ালা, সে নিজের বউ ছাড়া অপর কোনো মেয়েমানুষের গায়ে হাত ছোঁয়ায়নি এ পর্যন্ত, তার পেটে যতই খিদে থাক সে মানুষ খেতে যাবে কেন ?

মেয়েটি এক পা এগিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুইও আমারে খাবি ?

ত্রিলোচন এবার খানিকটা কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, তুমি কে ? কোথা থেকে আসলে এখানে ?

মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে আরও জ্বলন্ত চোখে তাকালো ত্রিলোচনের দিকে। প্রেতিনীর মতন হি হি করে হেসে উঠলো।

তারপর নিজের বুকের আঁচল সরাতেই দেখা গেল তার বুকের জামা ছিন্ন-ভিন্ন। একটা স্তন বেরিয়ে আছে, তার ওপর ছোপ ছোপ রক্ত। সেই স্তনটি বাঁ-হাতে চেপে ধরে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো, খাবি তো খা, খা, খা, খা ! কত খাবি খা !

॥ ২ ॥

বাবাজীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে, স্টেশনে পৌঁছোবার আগেই সে প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেল। বেশ শাঁসালো খদ্দের।

রাস্তার মধ্যে খারাপ হয়ে পড়ে আছে একখানা জিপ গাড়ি। বাবাজী সেটার কাছাকাছি আসতেই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে একজন মিলিটারি জওয়ান নেমে তাকে থামালো। ধপাধপ দুটো বাক্স-বিছানা তুলে দিয়েই সে বললো, জলদি চলো, রেল স্টেশন।

আজ যে সারাদিন রেল চলাচলের মাথামুণ্ডুর ঠিক নেই সেকথা আর ভাঙলো না বাবাজী। এই লোকটা বাবাজীর মুখচেনা, চেক পোস্টের হাবিলদার, মাঝে মাঝে বাজার করতে আসে। আজ বোধহয় হাবিলদার সাহেব ছুটিতে বাড়ি ফিরছে তাই এত ব্যস্ততা। বাবাজীও জোরে প্যাডেল চালালো।

একটু পরে সে জিজ্ঞেস করলো, সেপাইজী, মুল্লুক যাতা হ্যায় ? কাঁহা আপকা ঘর হ্যায় ?

হাবিলদার বললো, হরিয়ানা। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেন পাকাড়তে হোবে।

www.BanglaBook.org

বাবাজী বললো, মিল জায়গা আপকো ট্রেন। আভি টাইম হ্যায়। হরিয়ানা তো বহুৎ দূর হ্যায়, তাই না ? উৎনা দূরসে আপ বাংলা মুল্লুকমে নোকরি করনে আয়া ? ঘরমে বালবাচ্চা হ্যায় না ?

হাবিলদারটি খুব একটা গল্প করার মেজাজে নেই। মুখ বন্ধ রেখে সে শুধু নাক দিয়ে বললো, হাঁ।

বাবাজী রিকশায় মাল বয়ে নিয়ে মাত্র দুবার গেছে বর্ডার চেক পোস্টে। আট দশজন সেপাই থাকে সেখানে, কেউই বাঙালী নয়। বড় অদ্ভুত জীবন তাদের, নিজেরা নিজেরা থাকে, বড় একটা কোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে আসে না। গ্রামের লোকদের সঙ্গেও মেশে না। সপ্তাহে দুতিনবার শুধু বাজার করে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দুতিন জন ছাড়া বাকি সবাই দিনেরবেলা ঘুমোয়, রাত্তিরে জেগে থাকে। মাসের পর মাস ওরা কোনো মেয়েমানুষের মুখ দেখে না। যে পুরুষ মানুষরা সর্বক্ষণ শুধু অন্য পুরুষ মানুষের মুখ দেখে তাদের মাথার ঠিক থাকে কী করে ?

ওদের ওখানে কাজ করে লটকা, তার মুখ থেকে বাবাজী শুনেছে যে, ওরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করে, অকথ্য গালাগালি দেয়, এমনকি হাতাহাতি শুরু করে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। তবে ওদের যে ক্যাপটেন, সে একজন সর্দারজী, তাকে সবাই ভয় পায়। সে এক ধমক দিলেই ঝগড়া বন্ধ। তা হবে না, সর্দারজীর ধমক ! যখন তখন সে গুলি চালাবার ক্ষমতা রাখে। তা ছাড়া, সেই ক্যাপটেন সাহেব নাকি বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করতে পারে।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ ভাঙা বাংলা শিখে নিয়েছে, সর্দারজীটি নাকি গড়গড় করে বাংলা বলে। বড় সুন্দর চেহারা সেই সর্দারজীর, চোখদুটো দেখলে মনে হয়, আগের জন্মে মেয়ে ছিল।

বাবাজী আবার জিজ্ঞেস করলো, সেপাইজী, আপ কিৎনা দিন বাদ লৌটকে আয়েগা ?

এবার সে কোনো উত্তরই পেল না। এই সব তথ্য তার জানা যে খুব জরুরি তা নয়, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে বাবাজীর নিদারুণ কৌতূহল। এতদূর থেকে এরা চাকরি করতে এসে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে, এদের কি ভালো লাগে ? মানুষ রোজগার করে কেন, বাপ-মা, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে সুখে থাকবে বলেই তো !

বাবাজী একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

শুধু ছুটিতে বাড়ি ফেরার আনন্দ কিংবা ট্রেন ধরার উদ্বেগই নয়, লোকটির

www.BanglaBook.org

মুখে যেন দারুণ একটা আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা মিশে আছে। লোকটার মন একবারেই সুস্থ নেই। আহা রে, বোধহয় বাড়িতে কারুর গুরুতর অসুখ বিসুখের খবর পেয়েছে!

রোদ্দুরে পুড়ে যাচ্ছিল পিঠের চামড়া, হঠাৎ যেন একটু আরাম বোধ হলো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, কোথাও বৃষ্টি শুরু হলো নাকি? এদিকের আকাশেও তো গুঁড়ি মেরে আসছে কালো মেঘ। বাহারে বা, এতদিনে তবে বৃষ্টি এলো। আজকাল ভগবানের কথা চিন্তা করতেও মানুষ ভুলে গেছে, আকাশের দিকে চেয়ে লোকে শুধু ভাবে, বৃষ্টি হবে কি হবে না!

রিকশা থামাতেই হলো একবার। চেইন খুলে গেছে। হাবিলদারটি হুংকার দিয়ে উঠলো, কেয়া হুয়া?

বাবাজী বললো, কুছ নেহি হুয়া, সেপাইজী, আধা মিনিটকা মামলা!

হাবিলদার বারবার পেছন ফিরে তাকাতে লাগলেন। ও বোধহয় ভাবছে, জিপ গাড়িটা ভালো হয়ে গেলে চলে আসবে। কিন্তু পেছনে কোনো গাড়ির চিহ্নও নেই।

হাবিলদার একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার লাইটারটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল রাস্তায়। লোকটা সত্যিই বড় উতলা হয়ে আছে।

মেঘ এসে রোদ খেয়ে নিয়েছে, এখন আর চালাতে তত কষ্ট নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বাবাজী পৌঁছে গেল স্টেশনের চত্বরে।

হাবিলদার একটা দশ টাকার নোট তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাক্স-প্যাটরা তুলে নিয়েই ছুটলো প্ল্যাটফর্মের দিকে।

পাঁচ টাকা, বড় জোর ছ'টাকা পেলেই খুশি হতো বাবাজী। কেউ কেউ দরাদরি করে এতটা রাস্তার জন্যও চার টাকার বেশি দিতে চায় না। তার বদলে একেবারে দশ টাকা! অবশ্য খুব আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সবাই জানে সাধারণ থানার পুলিশের চেয়ে বর্ডারের সেপাইদের রোজগার অনেক বেশি। ওরা বাজারে এসে একসঙ্গে তিন জোড়া মুর্গী কেনে।

সাইকেল রিকশা মানে তো আসলে রিকশা নয়, ভ্যান গাড়ি। বসবার জায়গা নেই। তবে মাল বওয়া যায়। যাত্রীও নেওয়া যায়। যাত্রীরা পা ঝুলিয়ে বসে। একসঙ্গে চার-পাঁচজনযাত্রী পেলে রোজগার ভালো হয়।

বাবাজীর মনে হলো, এই তো যথেষ্ট হয়েছে, আর খাটবার দরকার কী। এবার বাড়ি ফিরলেই হয়। ত্রিলোচনের পাঁচ টাকা আর তার পাঁচ টাকা, একজন

www.BanglaBook.org

মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশি রোজগার লাগবে কেন ? তুমি যদি একদিনে অনেক টাকা রোজগার করে নাও, তা হলে অন্যে পাবে কী ? আরও যে পাঁচজন রিকশাওয়ালা ঝিম মেরে বসে আছে, তাদেরও তো হাতে কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে !

কিন্তু এত আগে আগে ফিরলেই ত্রিলোচন বকাঝকা শুরু করবে । রাত আটটা পর্যন্ত বাবাজীর ডিউটি ।

অন্য রিকশাওয়ালাদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এখনো কোনো ট্রেন আসেনি । স্টেশনটার কী রকম যেন মরা মরা ভাব । হাবিলদার বেচারি কী করবে এখন ? জিপটা থাকলেও না হয় কৃষ্ণনগর পর্যন্ত চলে যেতে পারতো । নাকি আজ সব ট্রেনেই ধর্মঘট হলো ।

এখন এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে । চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেতু, ওর কাছে অনেক খবর শোনা যায় । একসঙ্গে দশ টাকা রোজগার করার পর শুধু চা কেন, সঙ্গে দুখানা লেড়ো বিস্কুট খেলেই বা ক্ষতি কী ?

হঠাৎ একটা দোকান থেকে শিবেশ্বর একটা জলের পাম্প দুহাতে বয়ে এনে ভ্যানের ওপর রেখে বললো, ও বাবাজী, একটু রাজেন ঘোষের বাড়িতে পৌঁছে দেবে চলো তো !

বাবাজীর খুব অপরাধ বোধ হলো । অন্য রিকশাওয়ালারা হাত গুটিয়ে বসে আছে, তবু শিবেশ্বর এলো কি না তারই কাছে । পরপর দুটো সওয়ারি । এ ভারি অন্যায় । অন্যের মনে দুঃখ দিতে বাবাজীর একটুও ইচ্ছে করে না । কিন্তু সে কি করবে, সে তো আর শিবেশ্বরকে আগ বাড়িয়ে ডাকেনি । আর খদ্দের হলো লক্ষ্মী । নিজে থেকে খদ্দের এলে কক্ষনো ফেরাতে নেই । ত্রিলোচন যদি শোনে যে শিবেশ্বর তার রিকশায় মাল নিতে চেয়েছিল আর বাবাজী তাকে বলেছে তুমি অন্য রিকশায় যাও, তাহলে ত্রিলোচন তার পিঠের চামড়া তুলে নেবে না ?

অন্য রিকশাওয়ালাদের দিকে না তাকিয়ে বাবাজী প্যাডেল চালিয়ে দিল । পাম্পটা ঢকর ঢকর করে নড়ছে, শিবেশ্বর সেটা দুপা দিয়ে চেপে আছে । একবার দুবার শিবেশ্বরের পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে গেল, বাবাজী একহাত কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করলো । শিবেশ্বর পা সরিয়ে না নিলে সে কী করতে পারে ? শিবেশ্বররা ব্রাহ্মণ, এখন মিস্তিরির কাজ করে ।

শিবেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলো, একী বাবাজী, কোন্ দিকে চললে ? তুমি রাজেন ঘোষের বাড়ি চেনো না ?

www.BanglaBook.org

বাবাজী জিভ কেটে ফেললো। তাই তো, ডান দিকে বাঁক নেবার বদলে সে বাজারের দিকে যাচ্ছে কেন ? সেকি চোখের মাথা খেয়েছে ? সে চেক পোস্টের হাবিলদারটির কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ওরকম একটা উৎকণ্ঠা মাখা মুখ দেখলেই কারণ জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লোকটা যে কোনো কথাই বলতে চায়নি। বারবার শুধু পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। হায়রে সে জিপ আর এলো না। বড় রকমের জখম-টখম কিছু হয়েছে বোধহয়।

বাবাজী সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিল। রাজেন ঘোষের বাড়ি এ তল্লাটে কে না চেনে। আগে বাজারে তার একটা ছোট কাপড়ের দোকান ছিল, হঠাৎ তার কী হলো, দেখতে দেখতে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ, পাঁচ সাত বছরের মধ্যে একতলা বাড়িখানা হয়ে গেল তিনতলা। তার বাড়িতে প্রতি শনিবার অনেকে টেলিভিশানে সিনেমা দেখতে যায়।

শিবেশ্বর বললো, বাবাজী, গেরুয়া ধরে সাধু হয়েছো, আর কেন রিকশা চালাও, এবার ভগবানের চিন্তায় মন দাও !

বাবাজী বললো, শুধু ভগবানের চিন্তা করলে কি আর পেট ভরে গো দাদা ! ভগবান মানুষকে হাত-পা দিয়েছেন খেটে খাবার জন্য !

গ্রাম সম্পর্কে সবাই চেনাশুনো। কেউ মাঠে কাজ করে, কেউ স্টেশানের ধারে এসে দোকান খুলেছে, কেউ রিকশা চালায়। ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে বাধা নেই।

শিবেশ্বর বললো, বাবাজী, আর একটা বিয়ে করবে নাকি ? হাতে ভালো পাত্রী আছে, বয়েস এই ধরো গে পঁচিশ-ছাব্বিশ, আর দেখতে শুনতেও একেবারে ফ্যালনা নয়।

বাবাজী বললো, আমি বিয়ে করলে তোমার কি কিছু অসুবিধে হবে ?

শিবেশ্বর বললো, তা হতে পারে। প্রথমত একটা দুঃস্থ মেয়ের বাপ উদ্ধার হয়ে যাবে, আর তুমি যদি চাও তো, এই বয়েসে তোমাকে আর পরিশ্রম করতে হবে না, যে-কটা ছেলেমেয়ে চাও আমরাই ব্যবস্থা করে দেবো !

বাবাজী বললো, সেই ব্যবস্থাটা আগেই শুরু হয়ে গেছে বুঝি ?

রাজেন ঘোষের বাড়ির সামনে একটা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করছে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে রাজেন ঘোষ নিজে। এতবড় গাড়ি যার বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, তার কারবারটাও তো বড় হবেই। বাজারের সবাই বলাবলি করে, থানার দারোগা গোপেনবাবু নাকি একেবারে রাজেন ঘোষের হাতের মুঠোয়।

www.BanglaBook.org

দারোগার তুলনায় রাজেন ঘোষের চেহারাটা কিন্তু বেশ ছোটখাটো।

রিকশা থেকে নেমে শিবেশ্বর জিজ্ঞেস করলো, কত দেবো ?

বাবাজী উদাসীন ভাবে বললো, দ্যাও.....

ভাড়ার টাকা শিবেশ্বরের ডান হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল, সে হাত খালি করে দ্রুত নেমে চলে গেল। সবই খুচরো পয়সা। বাবাজী গুনে দেখলো আড়াই টাকা !

আজ কোন্ দিকে সূর্য উঠেছে ? দেড় টাকা হলেই যথেষ্ট ছিল, শিবেশ্বর চেনা লোক, এক টাকা পেলেও আপত্তির কিছু ছিল না। তার বদলে আড়াই টাকা ? ছেলে-ছোকরারা আজকাল পয়সাকে ধুলোমুঠি জ্ঞান করে ? বাবাজীর ভয় করতে লাগলো, এত সৌভাগ্য সহ্য হলে হয় ! ত্রিলোচনের মতন শক্ত মানুষ আজ কিছু পায়নি, আর সে এতগুলো টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলে সেই কারণেই না ত্রিলোচনের আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় !

আর কোনো কথা নয়, এবারে সোজা চায়ের দোকান।

বাবাজীর ইচ্ছে হলো, অন্য সব রিকশাওয়ালাদেরও চা খাওয়াতে, কিন্তু তার এই উদারতা এখানে কেউ ভালো চোখে দেখবে না। এখানে কেউ কাঁচা পয়সা ওড়াতে শুরু করলেই অন্যরা ভাবে, সেও স্মাগলারদের দলে নাম লিখিয়েছে !

চায়ের দোকানের সামনে এখনো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কেতু। তার বাড়ি গড়বন্দীপুরে হলেও সে দক্ষিণপাড়ার ইস্কুলে দফতরির কাজ করে। কেতু আশপাশের অনেক কিছু খবরাখবর রাখে। এখন ইস্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি, তাই সারাদিনই প্রায় সে রেল স্টেশানের ধারে চায়ের দোকানে কাটায়।

এক ভাঁড় চা ও দু'খানা লেড়ো বিস্কুট নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে বাবাজী প্রথমে আরাম করে খেয়ে নিল। রোজগার ভালো হলে সেদিন চায়ের স্বাদ বেশি ভালো লাগে। কেতুর হাতে একটা চায়ের ভাঁড় রয়েছে, সুতরাং তাকে খাওয়াবার কোনো প্রশ্ন উঠলো না।

পুরো এক প্যাকেট বিড়ি কেনার পর সে কেতুর দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলো।

ধুতির ওপর একটা নীল হাফ শার্ট পরা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা চেহারা, কথা বলার সময় ভুরু দুটো কুঁচকে থাকে কেতু, যেন সে গভীর চিন্তা না করে কিছু বলে না। কাছে এগিয়ে এসে সে বাবাজীর কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে বললো, বেশ জম্‌পেশ করে মেঘ এসেছে গো ! আজ রাতে ভারি বাদল নামবে, এই আমি বলে

www.BanglaBook.org

দিলুম, দেখে নিও !

বাবাজী বললো, এইবার বৃষ্টি না নামলে যে সারাদেশ শুকিয়ে মরবে। হ্যাঁরে কেতু, হেকিমপুরের মেলার কথা আর কিছু শুনলি ?

কেতু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললো, তুমি তো গান গাবে বলেছিলে না ? নাম লিখিয়েছো ?

বাবাজী বললো, নাম লেখাতে হবে ? কোথায় লেখাবো ?

কেতু জোর দিয়ে বললো, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের কাছে। সেটাও জানো না ! গবরমেন্ট এ জেলার সব পঞ্চায়েতের কাছ ঠেঙে গায়ক-বাজনদারদের নাম চেয়ে পাঠিয়েছে।

নিজের অজ্ঞতায় কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে বাবাজী বললো, তা তো জানি না। দেরি হয়ে গেল নাকি ?

কেতু বললো, দেরি হলেই বা কী, তুমি কালই নামটা লিখিয়ে দাও, তারপর সব ব্যবস্থা আমার। আমাদের ব্রজেন মাস্টারমশাইয়ের হাতেই তো সব কিছুর ভার। তুমি সাপুড়েদের গান জানো ? সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে পারো ?

—সাপুড়েদের গান ? বোষ্টমবাড়ির ছেলে, আমি ওসব জানবো কী করে ?

—ব্রজেন স্যার বলছিলেন, নানা রকমের গান বাজনা জোগাড় করতে গভরমেন্টের অর্ডার হয়েছে। সাপুড়েদের গান গাইবার কোনো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এ তল্লাটে সাপুড়ে আর দেখাই যায় না। দু-একখানা গান শিখে নিতে পারো না ?

—আমি ভাবছিলুম কী জানিস কেতু, নিজের বাঁধা গান গাইবো। আমাদের গড়বন্দীপুরের কথা। ঠাকুর-দেবতার গান তো অনেকেই গায়। আমি যদি আমাদের নিজেদের কথা, ধর তোর আমার মতন মানুষের কথা বেশ জমাটি করে সুর দিয়ে.....

—কেউ এইসব গান শুনবে ?

—গেরামের মানুষই তো আসবে, তাই না ? আমাদের গড়বন্দীপুর তো আর আলাদা কিছু না, সবাই ভাববে, নিজেদেরই গেরামের কথা,নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা।

—ঠিক আছে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি বললে ব্রজেন স্যার কোনো কিছুতেই না বলেন না।

—আমার সঙ্গে যদি আর একজন কেউ যায় ? মানে, সঙ্গে বাজনদার চাই

www.BanglaBook.org

তো !

—একজন কেন, দুই-তিনজন নিতে পারো। হারমোনিয়াম নাও, ফ্লুট নাও, সবাই রাহা খরচ পাবে।

—তুই সব ব্যবস্থা করে দিবি ? আমার খুব শখ একবার কোনো বড় আসরে গাই।

—বাবাজী, তোমার গান একেবারে পাক্কা। তুমি ভাবো কি, আমি ঐ ফাংশানে ব্রজেন স্যারের সঙ্গে থাকবো, আর আমাদের নিজেদের গ্রামের কেউ গাইবে না, তাও কি হয় ? তুমি লেগে থাকো, ভালো করে প্র্যাকটিস করো, চাই কি একটা মেডেলও পেয়ে যেতে পারো। সেও আমি দেখবো।

—আমার গান অনেকখানি বাঁধা হয়ে গেছে, তুই আগে একদিন শুনবি ?

—আমি শুধু শুনলে তো হবে না, তোমাকে একদিন ব্রজেন স্যারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে·····ও হ্যাঁ, ভালো কথা, বাবাজী, তোমার কাছে দশটা টাকা হবে ? আমি বড় অসুবিধেয় পড়ে গেছি, জানো তো, ইস্কুল বন্ধ, দশটা টাকা আজ যদি ধার দিতে পারো, বড্ড উপকার হয়। সামনের মাসেই শোধ দিয়ে দেবো। মেলা শুরু হবার আগেই·····

বাবাজী স্তম্ভিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, এক বান্ডিল বিড়ি, এইসব দেখে কেতু তাকে বড়লোক ভেবেছে ? কিংবা হাবিলদার যখন দশ টাকা দিয়ে গেল, সেটা ও দেখে ফেলেছে নাকি ? নিশ্চয়ই তাই। নইলে দশ টাকা পুরো চাইবে কেন ? এর আগে কেতু তার কাছ থেকে দু'টাকা এক টাকা নিয়েছে, কখনো শোধ দেয় না।

কিন্তু এখন কেতু মোক্ষম সুযোগ বুঝে কোপ মারতে চাইছে, তার মুখের ওপর না বলা যায় না। ব্রজেন মাস্টারের বাড়ি হেকিমপুরে। তিনি যে সেখানকার মেলার একজন হর্তাকর্তা তা সবাই জানে। কেতু সেই ব্রজেন মাস্টারের পেয়ারের লোক। কেতুকে চটালেই সব পণ্ড !

মনে করা যাক, বটতলা থেকে আসবার পথে সে কোনো প্যাসেঞ্জার পায়নি। জিপ গাড়িটা খারাপ না হলে কি হাবিলদারটি লাফ দিয়ে তার রিকশায় উঠতো ? এস্টেশান পর্যন্ত তো প্রায় দিনই ফাঁকা আসতে হয়। যে-টাকা তুমি উপার্জন করতে নাও পারতে, হঠাৎ হাতে এসে গেল, সে টাকা অন্যকে ধার দিতে অসুবিধের কী আছে ? হয়তো কেতু সত্যিই আতান্তরে পড়েছে। বেচারার বড় সংসার।

www.BanglaBook.org

বাবাজী একবার ভাবলো কেতুকে বলবে, দশ টাকা পারবো না, পাঁচ টাকা নে আজ। কিন্তু কথাটা তার মুখে এলো না। সে ট্যাঁক থেকে অতি সন্তর্পণে দশ টাকার নোটটা কেতুর হাতে তুলে দিল।

নোটটাতে একটা চুমু খেয়ে কেতু বললো, বড্ড উপকার করলে দাদা। আজ লটারির শেষ দিন। আমার ডান হাতের তালু সারাদিন চুলকোচ্ছে, এবার একটা বাজি মারবোই!

কেতু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না, দৌড়ে চলে গেল।

তার রক্ত জল-করা পরিশ্রমের টাকায় কেতু লটারি খেলবে? এখানে অনেকেই লটারির টিকিট কাটে। লটারির দালালরা রিকশায় মাইক বসিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। একবার সত্যপ্রসন্নবাবু পঞ্চাশ টাকা জিতেছিলেন, তা ছাড়া এ পর্যন্ত আর কেউ কোনো প্রাইজ পায়নি। অনেকের ধারণা, নিজের টাকায় লটারি খেললে জেতা যায় না, তাই তারা অন্যের কাছ থেকে ধার করে টিকিট কেনে।

বাবাজী মনটাকে অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো। যা যাবার তা তো গেছেই, শুধুমুদু আপশোস করে লাভ কী?

গুমগুম করে মেঘ ডেকে উঠলো। এবার বৃষ্টি ঝেঁপে নামবেই। দুটো একটা বড় বড় ফোঁটা পড়ছে।

হঠাৎ বাবাজীর মাথায় দুটো লাইন এসে গেল:

সুখ আর দুঃখ যেন যমজ দুইটি ভাই
কখন কে যে দাঁড়ায় পাশে চেনার উপায় নাই
আহা যমজ দুইটি ভাই

বাবাজীর আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো। কেমন বিদ্যুৎ চমকের মতন কথাগুলো এলো। পালার মধ্যে কাজে লেগে যাবে। এই দুটো লাইন মাঝে মাঝেই ধুয়োর মতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। আহা, মা সরস্বতী দয়া করেছেন। কারুকে কিছু দিলেই অন্যভাবে কিছু পাওয়া যায়। কেতু তো তার উপকারই করে গেল টাকাটা ধার নিয়ে।

পালার শুরু হবে শিব আর সরস্বতী বন্দনা দিয়ে, বাবাজী তা আগেই বলে রেখেছে। সেই দুটি বন্দনা তাকে নতুন করে তৈরি করতে হবে না, ছোটবেলা ত্রিলোচনের বাবার মুখে সে অনেকবার শুনেছে, তার মুখস্থ। সেই বন্দনা দুটি ওস্তাদ রজবআলি শেখের রচনা। কত বড় বড় ভাবের কথা আছে তাতে, রজব আলির মতন কবিয়াল আর এ তল্লাটে হলো না।

www.BanglaBook.org

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেছে। আজ আর রোজগারের আশা নেই। এই বৃষ্টিটা থামলেই বাবাজী বাড়ির দিকে রওনা দেবে। হাতে আছে পৌনে দু'টাকা। আজ প্রায় কিছুই রোজগার হয়নি শুনলে ত্রিলোচন রাগ করবে না।

গুনগুনিয়ে সে গাইতে লাগলো সদ্য আকাশ থেকে পাওয়া লাইন দুটো। কোনোক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না। বাড়ি ফিরেই ত্রিলোচনের ছেলে বিষ্টুকে দিয়ে কথাগুলো লিখিয়ে নিতে হবে।

খানিকপরেই বিরাট গর্জন করে একটা ট্রেন এসে গেল। সারাদিন পরে এলো বলেই যেন তার তেজ বেশী, কোলাহলও শোনা গেল সারা পাড়া জুড়ে।

বাবাজী কোনো ব্যস্ততা দেখালো না। আগে অন্য রিকশাওয়ালারা প্যাসেঞ্জার ভরে নিক। সে নিজের দোষে দশটা টাকা খুইয়েছে, তা বলে তো অন্যদের চেয়ে সে বেশী সুযোগ দাবি করতে পারে না!

দুটি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে একটি দম্পতি শেষ পর্যন্ত এলো তার কাছে। বৃষ্টির জন্য অনেকে প্ল্যাটফর্মে এখনো দাঁড়িয়ে আছে, আজ যাত্রী বেশী হবে। অন্যরা বৃষ্টির সময় ভাড়া বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাবজী তা করতে পারবে না। বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে যারা সংসার করে, তাদের কাছে একটা টাকার দামও অনেক। এরা তাঁতীপাড়ার মোড় পর্যন্ত যাবে বলেও খাল ধার দিয়ে নিয়ে গেল আরও আধ মাইল ভেতরে, নামার পর দু' টাকার বেশী ভাড়া দিতে চাইলো না, বাবাজী প্রতিবাদ করলো না একটুও। কেন যেন তার ধারণা হয়ে গেছে, অন্যের কিছু উপকার করলে তার গানের পদ তাড়াতাড়ি মাথায় আসবে।

ঠিক তাই। তাঁতীপাড়া থেকে খালি রিকশা নিয়ে স্টেশানের দিকে আবার ফিরতেই আরও দু' লাইন মনে এলো :

রৌদ্রে পুড়ি বৃষ্টি ভিজি শরীর যেমন মাটি
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা সারা বছর খাটি
আহা শরীর যেমন মাটি

লুঙ্গিখানা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে, মাথার চুল-দাড়ি বেয়ে গাবগাছের মতন জল গড়াচ্ছে, তবু বাবাজী মহানন্দে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগলো। শরীরের যে-কোনো কষ্টই যদি তুমি গান গেয়ে বলো, তা হলে আর সে কষ্টের বোধ থাকে না।

স্টেশনের চত্বরের কাছে আসতে না আসতেই আবার সওয়ারি জুটে গেল। সাইকেল সারানোর দোকানটির সামনে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে উঠে পড়েই বললো, শীতলাতলায় যাবো, কত নেবেন ?

ভাগ্য বলে একেই ! শীতলাতলাতেই এই রিকশার গ্যারেজ, সেই পর্যন্ত যাত্রী পাওয়া গেলে আর ফিরতি পথে খালি আসতে হবে না, এর চেয়ে বেশী আনন্দের আর কী আছে ? আগের লোকটি কম ভাড়া দিয়েছে, তারপরেই এই রকম একটি যাত্রী পাওয়া তো ডবল ভাড়া পাওয়ার মতন ব্যাপার ! সুখ আর দুঃখ যেন যমজ দুইটি ভাই, কখন কে যে দাঁড়ায় পাশে বোঝার উপায় নাই····· ।

বাবাজী নীচু গলায় বললো, আপনার যা খুশি দেবেন ।

লোকটি বললো, আগে ভাড়াটা বলুন । আমি পরে ঝামেলা করা পছন্দ করি না !

মুখখানা চেনা নয় । আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলছে, মনে হয় বাইরের কোনো ভদ্রলোক । ভাবছে বুঝি, বৃষ্টি-বাদলার সন্ধের সময় গ্রামের রিকশাওয়ালা যা খুশি দর হাঁকবে । বাজারের মাছওয়ালারা যেমন করে ।

বাবাজী বললো, আপনি একটা টাকা দেবেন ।

লোকটি প্রায় আঁতকে উঠে বললো, এক টাকা ? দিনের বেলাতেই পাঁচ টাকার কমে কেউ নিতে চায় না । আমি কোথায় যাবো শুনেছেন তো ? শীতলাতলা !

এটা বাবাজীর একটা কৌতুক । রিকশাওয়ালার সঙ্গে চার আনা, আট আনা নিয়ে দর কষাকষি করে আনন্দ পায় অনেকে, বিশেষত ভদ্দরলোকেরা । কিন্তু সাধারণ যা রেট, তার থেকে অনেক কম চাইলে তা এরা নিজেরাই কিছুতে মেনে নিতে পারে না । পাঁচ টাকার জায়গায় এক টাকা ভাড়া দিয়ে কোনো ভদ্দরলোক বাড়িতে গিয়ে ভাত খেতে বসেও স্বস্তি পাবে না । ভূপেন গড়াইয়ের ছেলে কেষ্ট একদিন বাবাজীর সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত বাবাজীর গলা ধরে একটা ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, যাঃ শালা, তোকে এক পয়সাও দেবো না ! সত্যি দিলও না । হনহনিয়ে চলে গেল । এই জন্যই, ভূপেন গড়াই ইদানীং অনেক পয়সা করেছে বটে কিন্তু সে কোনোদিন ভদ্দরলোক হতে পারবে না । তার ছেলে এখন মটোর সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ায়, তবু লোকে তাকে আড়ালে বলে কেষ্ট গুণ্ডা !

বাবাজী বললো, হুঁ, শুনিছি, আপনি শীতলাতলায় কোন বাড়িতে যাবেন ?

কারুর বাড়িতে না । আমি হেল্‌থ সেন্টারে যাবো । আমি সেখানকার ডাক্তার, দেড় মাস হলো এসেছি । আপনি আমাকে দেখেননি আগে ?

www.BanglaBook.org

আইজ্ঞে না। আপনারে আমি দেখি নাই।

ওখানে অবশ্য অনেকদিন কোনো ডাক্তার ছিল না। এদিকে সহজে কেউ আসতে চায় না, যাতায়াতের যে বড্ড অসুবিধে। সারাদিনে দুটি মাত্র ট্রেন। তাও তো আজকের দুপুরের ট্রেন এলো এই সন্ধেবেলা। এই রাস্তাটায় আবার বাসও চলে না। এর মধ্যে একদিন তো আমি রাত ন'টার সময় কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে রিকশাও পাইনি। এতখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হলো।

আটটার পর আর বড় একটা রিকশা থাকে না। সওয়ারি জোটে না তো।

আজকেও পাবো আশা করিনি। এই বৃষ্টির মধ্যে যদি হাঁটতে হতো....তো স্টেশানে একখানা রিকশা ছিল। সে চাইলো কুড়ি টাকা। ব্যাটাকে চিনে রেখেছি, যদি কোনোদিন হেল্‌থ সেন্টারে আসে—

বাবাজী মনে মনে ভাবলো, পরাণ কিংবা শ্রীধর, পরান হওয়াই বেশী সম্ভব, ওর লোভ প্রতিদিনই বাড়ন্ত। যেন ওর লাটসাহেব হবার কথা ছিল, তার বদলে রিকশাওয়ালা হয়েছে বলে সব সময় রাগে ফুঁসছে। না হয় ইস্কুলে কয়েক কেলাস পড়েছিস, কিন্তু আজও তো অন্য কোনো রোজগারের ধান্দা করতে পারলি না। বর্ডারের কাছে চালানীর কারবার করতে গিয়ে একদিন অ্যাইসা ধোলাই খেয়েছিল পরাণ....

ডাক্তারটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাড়ি কোন্ গ্রামে?

আইজ্ঞে শেত্‌লাতলার কাছেই, নদীর ওপারে, গড়বন্দীপুর।

হুঁ, নাম শুনেছি। ওদিকটায় আমার যাওয়া হয়নি। আপনাদের গ্রামে কোনো পুরনো গড়টড় আছে নাকি?

লোকে তো বলে তাই। উঁচু মতন মাটির ঢিবি রইয়েছে এখনো।

কতদিনের পুরনো? কোন্ সেঞ্চুরির।

কী বললেন স্যার?

না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি যে এই বৃষ্টি ভিজে ভিজে রিকশা চালান, আপনার অসুখ করে না? জ্বর হয় না?

আমাদের জ্বর হলে আপনারা রিকশা চড়বেন কী করে স্যার!

অল্পবয়সী ডাক্তারবাবুটি এবার উচ্চ গলায় হেসে উঠলো। তারপর বললো, আমি বোকার মতন কথাটা বলে ফেলেছি, অমনি আপনি ঠিক খোঁচা মেরে উত্তরটি দিয়ে দিয়েছেন। এর আগে আপনি মোটে এক টাকা ভাড়া চাইলেন। আপনার নামটা কী?

www.BanglaBook.org

বাপ মায়ের দেওয়া নাম ছিল প্রাণকেষ্ট। কিন্তু লোকে এখন আমারে বাবাজী ডাকে। মস্করা করে বলে আর কী!

বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। সন্ধে হতে না হতেই একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু রাস্তাখানা পিচ বাঁধানো এবং মোটামুটি চওড়া। এক সময় এই রাস্তার মধ্যখানে, দুই দেশের সীমান্তে পুরোপুরি আগমন-নির্গমনের দ্বার ছিল। কাস্টমস, ইমিগ্রেশান চেকিং-এর সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। বছর দশেক আগে কোনো কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। তাই রাস্তাটা মরে গেছে। এখান দিয়ে বেশী দূর আর গাড়ি চলাচল করে না। এখন যে চেক পোস্টটা রয়েছে, সেটার কাজ শুধু পাহারা দেওয়া।

বাদলার দিন বলে কোনো সাইকেলও চলছে না। এদিকে ডাকাতির ভয় আছে। এদিকের ডাকাতরা সীমান্ত পেরিয়ে ওদিকে ডাকাতি করে আসে, আর ওদিককার ডাকাতরা আসে এদিকে। অন্তত পুলিশের লোক তো সেই কথাই বলে।

ডাক্তারবাবুটি সে কথা জানে। বাবাজী পাকা রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের একটা সুরকির রাস্তায় নেমে পড়তেই সে হা- হা করে বলে উঠলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? আমি শীতলাতলা যাবো বলেছি না?

বাবাজী বললো, এই দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে স্যার।

না না, না,আমি বড় রাস্তা দিয়ে যেতে চাই। আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে কে বলেছে। আমি যে রাস্তা চিনি সেই রাস্তা দিয়ে যাবেন!

এক ঘন্টা বৃষ্টিতে ভিজেছি, তাড়াতাড়ি পৌঁছানো এখন আমারই দরকার বেশী।

ও, এই জন্যই এক টাকা ভাড়া বলে ভড়কি দিয়ে দিলে তুমি? শিগগির গাড়ি ঘোরাও!

একটু ভয় পেতেই আপনি থেকে তুমি হয়ে গেল। এরপর তুই হবে।

রাস্তাটা এখানে ঢালু, প্যাডেল না করলেও হুড়হুড়িয়ে গাড়ি চলে। ডাক্তারের হুমকিতে কোনো উত্তর না দিয়ে বাবাজী মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

ঝ্যারঝ্যার আওয়াজ করে আপন গতিতে ছুটতে লাগলো রিকশাটা, ডাক্তারটি কী বলতে লাগলো তা আর শোনা গেল না। অদূরে দেখা গেল গ্রাম বসতির বিন্দু বিন্দু আলো। তা দেখেই বোধহয় শহুরে ডাক্তারটি খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

প্রায় মাঠের মাঝখান দিয়ে আর একটা ছোট পথ দিয়ে চালিয়ে এসে বাবাজী

www.BanglaBook.org

বললো, ঐ যে ডান দিকে বড় বাতি জ্বলছে। ঐটাই তো স্যার, আপনার হাসপাতাল ?

ডাক্তারটি এবার একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। রিকশা থেকে নেমে সে চাপা গলায় বললো, এ রাস্তাটা আমার চেনা ছিল না, আগে অনেক ঘুরে এসেছি। তোমার কাছে পঞ্চাশ টাকার নোটের ভাঙানি আছে ?

আইজ্ঞা না। অত টাকা পাবো কোথায় ?

সারাদিনে কত রোজগার করো তোমরা ? পঞ্চাশ টাকা হয় না ?

দিনে পঞ্চাশ টাকা হলে মাসে কত হয় স্যার ?

শোনো, পঞ্চাশ টাকার নোট ছাড়া আমার কাছে আর খুচরো চারটাকা মাত্র আছে। বৃষ্টির দিন বলে তোমাকে পাঁচ টাকার বদলে ছ' টাকা দেওয়া উচিত, কিন্তু দিতে পারছি না যে !

আমি তো এক টাকার বেশী চাই নাই !

ডাক্তারটি এই রকম নেহাত একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আর সময় ব্যয় করতে রাজি হলো না। সে চারটে টাকাই বাবাজীর হাতে দিয়ে বললো, আবার কোনো একদিন বাকি দু' টাকা নিয়ে নিও। আমার নাম নবেন্দু ডাক্তার।

ঠিক আছে, স্যার। এই তো অনেক দিলেন। আর বেশী তো দরকার নাই।

ডাক্তারটি এমনভাবে বাবাজীর মুখের দিকে তাকালো যেন সে বোঝার চেষ্টা করলো, এই লোকটি তাকে বিদ্রূপ করছে কি না। অল্প আলোয় মুখ দেখা যায় না ভালো করে। সে বললো, টাকার দরকার না থাক, অনেক সময়েই তো ডাক্তারের দরকার হয় মানুষের। সে রকম কিছু হলে বিনা দ্বিধায় চলে আসবেন আমার কাছে।

সাইকেল রিকশাটা নিয়ে খেয়া পার হওয়া যায় না বলে সেটা নদীর ধারের ছোট্ট মুদিখানার পেছনে রাখতে হয়। এ জন্য কালাচাঁদকে দশ টাকা দিতে হয় প্রতি মাসে। কালাচাঁদ চা-ও বিক্রি করে, রিকশা রাখার সুবাদে বাবাজী এখানে ধারে চা খেতে পারে।

কালাচাঁদ দোকানে নেই, সেখানে বসে আছে তার বারো বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। এই বয়েসের মেয়ে বেশ টরটরে কথা বলে, জিনিসপত্র ঠিকঠাক ওজন করতে পারে, মুসুরির ডালের কিলো সাড়ে চার টাকা হলে দেড়শো গ্রামের দাম কত হয়, তা মুহূর্তে বলে দেয়।

রিকশাটা দোকানের পেছনে রেখে, চেন দিয়ে বেঁধে তালা আটকে ফিরে এসে

www.BanglaBook.org

বাবাজী বললো, এক গেলাস চা খাওয়াও তো মালক্ষ্মী !

তোলা উনুনে ব্যাঁকাত্যাড়া একটা কালচে কেটলিতে অনবরত জল ফুটছে। ছাঁকনিতে গুঁড়ো চা ফেলে লক্ষ্মী এক মিনিটের মধ্যে চা বানিয়ে দিল।

অন্যদিন এখানে গ্রামের দু' চারজন মানুষ বসে গুলতানি করে। বাড়ি ফেরার পথে বাবাজীর এখানে এক গেলাস চা বাঁধা। এক একদিন সে এখানে বসে অন্যদের গান শোনায়। আজ বৃষ্টির জন্য কেউ নেই।

বৃষ্টি এখনো থামেনি, এখনও ছিপছিপ করে পড়েই যাচ্ছে। দোকানের লণ্ঠনের একটুখানি আলো পড়েছে রাস্তায়, তাছাড়া সবদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। নদীর ওপারে দুটো কুকুর পালা করে ডাকছে।

আরাম করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাবাজীর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

ওবেলা ত্রিলোচন কিছু রোজগার না করে বাড়ি ফিরেছে। গতকাল রাত্রে জ্যামনি যেন চাল কেনার বিষয়ে কী বলছিল। তা হলে আজ বাড়িতে চাল বাড়ন্ত না তো ? রাত্তিরে পেট ভরে ভাত না খেলে বাবাজীর ঘুম আসে না।

বাবাজীর নিজের সংসার নেই। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে ছিল, তার মধ্যে ছেলেটা কলেরায় মরেছে খুব অল্প বয়েসে। তার বউ শুধু একটি মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পেরেছে। অন্য মেয়েটিও বেশ ডাগর হয়েছিল, তাকে একা বাড়িতে রেখে বাইরে বেরুনো মুশকিল। মোট তিন বিঘে ধান জমি ছিল, তা বেচে দিয়ে সেই মেয়েটারও বিয়ে সারা হয়ে গেল। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে বারাসতে, তারা কাছাকাছি থাকে। এরপর সংসারের পাট তুলে দিয়ে বাবাজী এসে ঠাঁই নিয়েছে তার বাল্যবন্ধু ত্রিলোচনের বাড়িতে। ত্রিলোচনের ছেলেমেয়েদের সে নিজের সন্তানের মতন ভালোবাসে।

বাবাজী ভাবলো, দু কিলো চাল কিনে নেওয়া যাক। টাকা পয়সা, কাগজের নোট, এসবের আর কী দাম আছে, চাল-ডাল কেনার জন্যই তো ! কাগজের নোট নিয়ে বাড়ি ফেরার বদলে এক ঠোঙা চাল নিয়ে বাড়ি ফেরার মধ্যে অনেক বেশী জীবনের স্বাদ আছে। আর কিছু না থাক, এই বৃষ্টির দিনে শুধু গরম গরম ফেনা ভাতই ভালো লাগবে।

দু' কিলো চাল মেপে দাও তো মা লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী বললো, পয়সা আছে তো ? আমি কিন্তু ধারে দিতে পারবো না, বাবা বলে গেছে।

তোমার বাবা না থাকলে ধার চলে না, সে আমি জানি। নগদ পয়সাই পাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গামছা আনুন !

লক্ষ্মী এমন হিসেবী মেয়ে যে দু' কিলো চালের জন্য সে ঠোঙাও দেবে না।

এতক্ষণে বাবাজীর খেয়াল হলো যে রিকশার সীটের তলায় তার যে গামছাখানা আছে, সেটা দিয়ে সে একবার ভিজে মাথাটা মুছে নিতে পারতো। ভাগ্যিস মোছেনি, তা হলে সেই ভিজে গামছায় চাল নেওয়া যেত না।

উঠে গিয়ে সে গামছাটা নিয়ে এলো। লক্ষ্মী একটা ঠোঙাতে করেই চাল মাপছে। হাতায় করে সে একটুখানি তুলে নিচ্ছে ঠোঙা থেকে, আবার দুটি চারটি করে ফেলছে, পাল্লার কাঁটার দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন একটা চালও বেশী না যায়।

যে-কোনো কাজে কেউ যখন খুব একাগ্র হয়ে যায়, তখন তা দেখতে বড় ভালো লাগে বাবাজীর। শাড়ীর বদলে একটা হলদে রঙের ফ্রক পরে আছে লক্ষ্মী, ফ্রকটা তার গায়ে ছোট হয়। এখন তার যা বয়েস, প্রতি মাসেই ফনফনিয়ে শরীরখানা বাড়বে, নিজের মেয়েদের তো দেখেছে বাবাজী। আর দু' তিন বছরের মধ্যেই লক্ষ্মীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে কালাচাঁদকে। আহা, এমন কাজের মেয়ে যার ঘরে যাবে, সে কত ভাগ্যবান। ত্রিলোচনের ছেলে বিষ্টুর সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ করলে হয় না ?

লক্ষ্মী পাল্লা থেকে ঠোঙাটা নামিয়ে গামছার ওপর চাল ঢালছে, বাবাজী পয়সা গুনতে গুনতে জিজ্ঞেস করলো, তোর বাপ এসময় কোথায় গেছেরে, লক্ষ্মী ?

আপনাদের বাড়িতেই তো গেছে। আরও কত লোক দৌড়ে দৌড়ে গেল।

কেন, কী হয়েছে আমাদের বাড়িতে ?

আপনি জানেন না ? আপনি খবর শোনেননি ?

বুকের ভেতটা খাঁ খাঁ করে উঠলো বাবাজীর। হঠাৎ কেউ মারা গেল ? কে ? জিজ্ঞেস করতেও ভয় হচ্ছে। ত্রিলোচনেরই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কদিন ধরে।

লক্ষ্মী বললো, তিলুকাকা বাড়িতে একটা পেতনী ধরে এনেছে !

অ্যাঁ ! কী বলিসরে তুই ? আমার সাথে মসকরা করছিস ?

ঐ যে বটগাছতলায় একটা পেতনী আসে মাঝে মাঝে, মানুষ খায়, সেটাকে আজ তিলুকাকা জ্যান্ত ধরে এনেছে গো ! সবাই দেখতে গেল।

সাধারণত গম্ভীর থাকে লক্ষ্মী, এইবার সে হেসে উঠলো। যেন একটা পেতনী দেখার জন্য বয়স্ক লোকদের ছুটে যাওয়াটা তার কাছে খুব ছেলেমানুষীর

www.BanglaBook.org

ব্যাপার। তার হাসিতে সেই অবজ্ঞার সুর।

নদীর ধারটা ঢালু, ঘাটের কোনো বালাই নেই। অন্যদিন বাবাজী খোঁড়া পা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সাবধানে নামে। আজ বৃষ্টির জন্য মাটি আরও পিচ্ছিল হয়ে আছে। সে সব কিছু খেয়াল রইলো না বাবাজীর, গামছায় গিঁট বেঁধে সে দৌড় মারলো।

॥ ৩ ॥

স্ত্রীলোকটি যে ডাকিনী-যোগিনী নয়, জোছ্‌নাকুমারী নয়, সাধারণ কোনো গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তা বুঝতে ত্রিলোচনের পাঁচ মিনিটও লাগেনি। মানুষের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই তার নেই, বরং একাধিক পুরুষমানুষ যে তার শরীর খুবলে খাওয়ার চেষ্টা করেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে তার সর্বাঙ্গে। সেই সব অত্যাচারের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, তার ব্যবহারে একটা পাগল পাগল ভাব।

মেয়েটি যখন বুঝলো যে অন্য পুরুষ মানুষের মতন এই লোকটি তাকে খেতে আসছে না, তার চুলের মুঠি চেপে ধরেনি, তখন সে অবসন্নভাবে পা ছড়িয়ে বসে আবার দুর্বোধ্য স্বরে কাঁদতে লাগলো।

সেই অবস্থায় ত্রিলোচন চলে যায় কী করে ? আজকাল অবশ্য কেউ অপরের ঝঞ্ঝাটে মাথা গলাতে চায় না, কিন্তু মাথার ওপর তো ভগবান আছেন, পরলোকে গিয়ে পাপ-পুণ্যের জবাবদিহিও করতে হবে সকলকে। একটা অসহায় অসুস্থ স্ত্রীলোককে দেখেও চোখ ফিরিয়ে চলে গেলে তা কি ধর্মে সইবে ? গরিব বলে কি ত্রিলোচনের ধর্ম নেই ! এখন সে সাইকেল রিকশা চালায় বটে, তবু সে কবিয়াল মনোহর সাঁতরার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

একটু দূরে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ত্রিলোচন বললো, ওগো মেয়ে, তোমার ভয় নাই গো, এখানে কেউ তোমারে কিছু ক্ষতি করবে না। আর কেন্দো না।

ত্রিলোচন আরও দু'তিনবার এই একই কথা বলার পর মেয়েটি কান্না থামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

ত্রিলোচন জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়ি কোথায় ? ঐ পারে ?

স্ত্রীলোকটি আস্তে আস্তে একটা হাত তুলে বর্ডারের দিকটা দেখালো। তারপর দু'বার বললো, ঐদিকে, ঐদিকে !

ত্রিলোচন জিভ দিয়ে আফসোসের চুক চুক শব্দ করে বললো, তুমি একা

www.BanglaBook.org

মেয়েছেলে বর্ডার পার হইয়ে আসতে গেলা কোন সাহসে ? এমন কেউ করে ?

বিনা পাশপোর্টের যাতায়াত এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, কিন্তু সে সব করে ধুরন্ধর লোকেরা। আর সাধারণ, নিরীহ মানুষ যারা এপারে-ওপারে দু'চারদিনের জন্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দেখা করতে যায়, তাদেরও দালালদের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু একা কোনো রমণী বর্ডার পার হয়ে এলো কী করে, সেটা আশ্চর্য বটে !

—তুমি হিন্দু না মোছলমান ?

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি এদিক ওদিক তাকালো। ঝোড়ো বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে বটগাছের ডাল, এক সঙ্গে অনেক পাখি কিচির মিচির লাগিয়েছে, দিগন্তে জমাট বেঁধেছে কালো মেঘ।

বুকের আঁচলটা টেনে সে জিজ্ঞেস করলো, এইটা কি ভারত ?

—হ্যাঁ, এটা ভারত, ইন্ডিয়া। তুমি একা একা চলে এলে কেন ?

—আমার বাবার নাম মণীন্দ্র সাহাবাবু। আমার নাম বীণা। আমার বাবায় ছুটবেলা মইরা গ্যাছে।

ত্রিলোচনের মতন লোকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে। গড়বন্দীপুরের পাশের গ্রামের নাম কদমতলি, সেখানকার সামন্তদের বাড়ির ছোট ছেলে জিতেন হঠাৎ গোঁ ধরে বসলো, ভেড়ির মালিক হাসমত শেখের মেয়ে মালেকাকে সে বিয়ে করবে। কী করে, কখন যে দু'জনের আশনাই হলো তা কে জানে ! তাই নিয়ে সে কি হুলুস্থুলুস কাণ্ড ! দুই পক্ষের বাড়িতেই ঘোর আপত্তি। সামন্তদের এককালে নাকি ছোটখাটো জমিদারি ছিল, এখন খুবই দুরবস্থা যদিও কিন্তু তেজ আছে। সামন্তবাড়ির বড়কর্তা জিতেনকে চাবুক পেটা করলেন। হাসমত শেখও পয়সাওয়ালা জবরদস্ত লোক। শেষে গুজব রটে গেল, এই নিয়ে বুঝি দাঙ্গা বেঁধে যায়। হিন্দুপাড়ার মুরুব্বিদের পরামর্শে জিতেনকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো শক্তিনগরে, আর হাসমত শেখ তার মেয়েকে ঘরের মধ্যে শেকলবন্দী করে রাখলো। কিন্তু বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো। একদিন দেখা গেল দুই পাখি জোড়ায় মিলে উড়ে গেছে। হাসমত শেখের ঘরে নেই তার কন্যা মালেকা, আর শক্তিনগরেও নেই জিতেন, দু'জনেই বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে বাংলাদেশে। আর তাদের কে ধরে !

ত্রিলোচন বুঝে নিল, ওপারেও সেরকম কিছু ব্যাপার হয়েছে। হিন্দুর মেয়ে বীণাকে বিয়ে করতে চায় কোনো মুসলমান ছেলে। কিন্তু মেয়েটা একা কেন ?

www.BanglaBook.org

সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গের মানুষ কোথায় গেল ?

মেয়েটির চিন্তাশক্তি এখনো পরিষ্কার নয়, কথাবার্তা অসংলগ্ন। কোনো প্রশ্নেরই সে সরাসরি উত্তর দিতে পারে না। সে বললো, বৃষ্টি নামছে, এখন আমি কোথায় যাবো ?

ত্রিলোচন বললো, সেই তো কথা। এদিকে তোমার জানাশুনা কেউ আছে ? থাকবা কোথায় ? তোমার পাছপোট নাই, পুলিশে ধরবে।

—আমার ক্ষুধা পাইছে। তিন দিন কিছু খাই নাই। আমারে অরা কিছু খাইতে দেয় নাই।

এই দ্যাখো কাণ্ড, এখন তো একে ফেলে যাওয়া আরও মুশকিল হলো।

ত্রিলোচনের বাবা বলতো, সব মানুষের মধ্যেই নারায়ণ আছে। ক্ষুধার্ত মানুষকে দুটি খেতে দিলে ভগবান তৃপ্তি পান। এত অভাবের সংসার, তবু বাড়িতে কোনো ভিখিরি এলে এক মুঠো চাল দেওয়া হয়। নিজের যখন কোনো উপার্জন নেই, গলা গেছে নষ্ট হয়ে, সেই সময়েও মনোহর সাঁতরা শিবমন্দিরের চাতাল থেকে এক অসুস্থ সাধুকে বাড়িতে এনে তিন দিন খাইয়ে পরিয়ে রেখে ছিল। বাবার মেডেল বিক্রি করা টাকাতেই তো ত্রিলোচন কিনেছে সাইকেল রিকশাখানা !

ত্রিলোচন বললো, চলো, আমার বাড়িতে চলো। তোমার ভয় নাই, বাড়িতে আমার বউ ছেলেমেয়ে আছে, আজ রাত্তিরটা তো থাকো। তারপর দেখা যাবে।

মেয়েটি একটুও আপত্তি করলো না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই। ত্রিলোচন এতক্ষণ নিজের খিদে-তেষ্টাও ভুলে গিয়েছিল। এবার সে জোরে পা চালালো। মেয়েটি পেছন পেছন আসছে, হাত দু'খানা বুকের কাছে জড়ো করা, খুঁ খুঁ করে কান্নার শব্দ হচ্ছে।

খেয়াঘাটে কেউ নেই ! মেয়েটিকে নৌকোয় বসিয়ে ত্রিলোচন দড়ি টানার বদলে বৈঠা জলে ডোবালো। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সারা গা, মেয়েটি একটানা কেঁদে চলেছে। এটা শারীরিক কষ্ট ও ক্ষুধার কান্না। একবার সে নদী থেকে এক আঁজলা জল তুলে খেয়ে নিল।

ওপারে পৌঁছোবার পর ত্রিলোচনের মনে পড়লো, তার কাছে বিড়ি নেই। বিড়ির নেশা বড় নেশা ! খালি পেটে তবু একদিন থাকা যায়, কিন্তু বিড়ি ছাড়া যে অসম্ভব। ভাত খাওয়ার পর একখান বিড়িতে টান দিতে না পারলে কোনো সুখই

www.BanglaBook.org

হয় না।

শিবমন্দিরের পিছন দিয়ে ত্রিলোচনদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা, মন্দিরের সামনের দিকে একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। ত্রিলোচন মেয়েটিকে বললো, তুমি এইখানে একটু খাড়াও, আমি বিড়ি কিনে নিয়ে আসি, এই যাবো আর আসবো !

নদীর ধারে, খেয়া নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো মেয়েটি, তার দু'চোখে শুধু কান্না। যেন তার সমস্ত ভবিষ্যতটাই কান্নায় ঝাপসা হয়ে আছে।

এই সময়ে হলো এক কাণ্ড !

শিবমন্দির থেকে বেরিয়ে এলো গোষ্ঠবিহারী। সকাল থেকেই গাজা টেনে টেনে তার চক্ষু দুটি লাল। মেজাজের মাথায় সে বেসুরো গান গাইছে। একটুখানি এসেই সে আঁতকে উঠলো। সেই নদীর ঘাট, খেয়া নৌকোর পাশে সেই অচেনা রমণীমূর্তি, তার চোখে জল। সেই মধুর সর্বনাশা দৃশ্য। গোষ্ঠবিহারীর ভুরু দুটো কপাল ছাড়িয়ে যাবার জোগাড়।

আগের বার কেউ কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি, এবার সে সবাইকে ডেকে দেখাবে।

সে বিকট চিৎকার করে উঠলো, ওরে, ডাকিনী রে, সেই ডাকিনী। শিগগির আয়, দেখবি আয়। ওরে পচা, ওরে গোবিন্দ—ডাকিনী, পিশাচী

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলো।

এককালে এখানে একটা ঘাট ছিল, এখন রয়েছে তার ভগ্নস্তূপ। সেখান থেকে একটা আস্ত ইঁট তুলে নিয়ে সে বললো, খবর্দার, হারামজাদী ! জলে নামার চেষ্টা করলেই তোর মাথা ফাটাবো !

বৃষ্টির সময় না হলে এই চিৎকারে বহু লোক জমে যেত। তবু কাছাকাছি দোকান ও শিবমন্দিরের চাতাল থেকে ছুটে এলো কয়েকজন। চিৎকারটা ত্রিলোচনের কানেও গেছে। বিড়ি হাতে নিয়ে সে দ্রুত এসে দেখলো, ষাঁড়ের মতন চিৎকার করতে করতে, লাফাতে লাফাতে, ইঁট হাতে নিয়ে গোষ্ঠবিহারী একটু একটু করে এগোচ্ছে, আর মেয়েটা বসে পড়ে, খানিকটা পেছন দিকে হেলে ভয়ার্ত জন্তুর মতন চেয়ে আছে সেদিকে।

ত্রিলোচন দৌড়ে গিয়ে গোষ্ঠবিহারীকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, এই গুষ্ঠে, কী কচ্ছিস ! এ মেয়েটা আমার সঙ্গে এসেছে !

গোষ্ঠবিহারী বললো, তোর সঙ্গে এসেছে ? তোকে খাবে রে, তোকে খাবে

www.BanglaBook.org

বলে মতলব করেছিল। সরে যা তিলু, সরে যা ! আমি বজ্জর-যোগিনী মন্তর জানি, আমি আজ ডাকিনীটাকে বেঁধে ফেলবো !

ত্রিলোচন গোষ্ঠবিহারীর হাত থেকে ইঁটটাকে কেড়ে নিয়ে বললো, পাগলামি থামা তো ! এ একটা ওপার বাংলার মেয়ে, অনেক কষ্ট করে এসেছে

গোষ্ঠবিহারী বললো, তোকে এইসব বলে ভুলিয়েছে ! বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস রে, তিলু ! আমি এসে পড়েছি। আর ভয় নাই। আগেই বলেছি না, এইসব ডাকিনীরা শিবমন্দিরের ধারে ঘুরঘুর করে। আজ হারামজাদী পালাতে পারবে না, ওরে আমি পোড়াবো !

ত্রিলোচন গোষ্ঠবিহারীকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বললো, চলো !

মেয়েটি অমনি ত্রিলোচনের হাত কামড়ে দিল।

পেছনে যে ছোট ভিড়টি জমে উঠেছিল, তারা শিউরে উঠলো এই দেখে। কেউ ওরে বাবারে, রাক্ষুসী রে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। গোষ্ঠবিহারী যাত্রাদলের কাপালিকের মতন একটা হাসি দিয়ে বললো, দেখলে, দেখলে, সকলে দেখলে !

ত্রিলোচন কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল না। মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললো, ওরকম করে না ! চলো আমার সাথে ! বলেছি না, তোমার কোনো ভয় নাই !

মেয়েটি এখন আর ত্রিলোচনের সঙ্গে যেতে চায় না। সে টানাটানি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ত্রিলোচন গ্রাহ্য করলো না, সে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে চললো তাকে।

জনতা দৌড়ে পালিয়ে গেল খানিকটা দূরে, গোষ্ঠবিহারী বাধা দিতে এলে ত্রিলোচন তাকে চোখ রাঙিয়ে বললো, খবর্দার, গুষ্ঠে ! সরে যা !

প্রায় একদমে ছুটে সে মেয়েটাকে এনে ফেললো নিজের বাড়িতে।

বড় ঘরটায় দাওয়ায় বসে জ্যামনি কুপিতে তেল ভরছিল, চোখ তুলে দেখলো জলে ভেজা এই দুই মূর্তিকে।

জ্যামনি কিছু বলার আগেই ত্রিলোচন হুকুম দিল, দুই জায়গায় ভাত বাড়। এই মেইয়েটা তিন দিন কিছু খায় নাই, ওকেও খেতে দে !

অদ্ভুত প্রকৃতির স্ত্রীলোক এই জ্যামনি। সে আর মুখ খুললোই না। গলার ঝাঁঝ শুনেই সে বুঝেছে, এখন কোনো প্রশ্ন করতে গেলেই সে ত্রিলোচনের হাতে মার খাবে। স্বামীর বিরুদ্ধে তার যত নালিশই থাকুক, সে এটা জানে যে কোনো বদ উদ্দেশ্যে ত্রিলোচন বাড়িতে একটা অচেনা মেয়েমানুষ নিয়ে আসবে না। সে

www.BanglaBook.org

ভাত বাড়তে চলে গেল।

ত্রিলোচন দু'গেরাস ভাতও মুখে দিতে পারেনি, তার মধ্যেই দপদপিয়ে একদল মানুষ চলে এলো। ভিড় হয়ে গেল উঠোনে। তাদের নেতা গোষ্ঠবিহারী।

শরীরের তুলনায় গোষ্ঠবিহারীর গলাখানা বাজখাঁই। সে বললো, ঐ ডাকিনীটারে আমার হাতে দিয়ে দে, তিলু ! মন্তর দিয়ে আমি ওর শক্তি হরণ করে নিয়েছি। সর্ব সমক্ষে আমি ওর পিশাচিনী রূপ দেখাবো ! নইলে তোর সংসার জ্বলে পুড়ে যাবে।

ত্রিলোচন গম্ভীর ভাবে বললো, এখানে ঝামেলা করিসনি, গুষ্ঠে। আমি খেতে বসেছি। আমার ভালো মন্দ আমি নিজে বোঝবো !

গোষ্ঠবিহারী এবার জ্যামনিকে উদ্দেশ্য করে বললো, ওগো, তোমার সোয়ামীরে ঐ ডাকিনী মায়ায় বেঁধেছে। তুমি ওরে সামলাও !

ত্রিলোচনের রাগ মাথায় চড়ে গেল।

গাঁজা কি মানুষে খায় না, অনেকেই খায়, ত্রিলোচনও অনেকবারই খেয়েছে। তা বলে সকাল থেকেই গাঁজায় দম দিয়ে কেউ যদি কাণ্ডাকাণ্ডি ভুলে যায় আর অন্যের বাড়িতে এসে অনাসৃষ্টি করে, তবে তাকে কি সহ্য করা যায় ?

এঁটো হাতেই ছুটে গিয়ে ত্রিলোচন সপাটে এক চড় কষালো গোষ্ঠবিহারীর গালে।

ক্রোধ যেন ক্ষ্যাপা হস্তি বিষম বালাই
সংসারেতে ক্রোধের মতন এমন শত্রু নাই
আহা বিষম বালাই
ক্রোধের বশে ত্রিলোচনের হিতাহিত ঘুচিল
ভাতের থালা ফেলিয়া সে গোষ্ঠকে মারিল
আহা হিতাহিত ঘুচিল

তারপর কী হলো ?

এরপর সঙ্কট আরও ঘোরালো হয়ে এলো, সব কিছু ত্রিলোচনের হাতের বাইরে চলে গেল। শুধু একলা একজন মানুষের জেদ কিংবা শারীরিক শক্তি দিয়ে তো জনতাকে রোখা যায় না। জনতা বড় নিষ্ঠুর হয়, জনতার বিবেকের বালাই নেই।

অন্তত জনা দশ বারো লোক নদীর ঘাটে স্বচক্ষে দেখেছে যে ঐ ডাকিনীটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ত্রিলোচনের হাত কামড়ে ধরেছিল। তবু যে ত্রিলোচন ওকে ছাড়তে চায়নি, এটা তার বুদ্ধিনাশ ছাড়া আর কী ? সে কুহকে পড়েছে। সবাই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে ত্রিলোচনের হাব ভাব পাগলের মতন। নইলে, ভাতের থালা ফেলে এসে কেউ কি গ্রামের একজন পরিচিত মানুষকে মারে ?

গোষ্ঠবিহারী তো অন্যায় বলেনি। মেয়েটা সত্যিই ডাকিনী না সাধারণ মানুষ তা সর্বসমক্ষে প্রমাণ হয়ে যাক। গোষ্ঠবিহারী শিবপুজো করে, কালী পুজো করে, সে মন্তর জানে। সে সবাইকে বলেছে, মন্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপড় পুড়িয়ে জোর করে তার গন্ধ শোঁকালেই ডাকিনীর আসল রূপ বেরিয়ে পড়তে বাধ্য।

ত্রিলোচন গোষ্ঠবিহারীকে চড় মারার ফলে অন্য তিন চার জন লোক ধাক্কাধাক্কি করে ত্রিলোচনকে ফেলে দিল উঠোনের জল কাদার মধ্যে। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন লাথি মারতে লাগলো তাকে। তিরিক্ষি মেজাজে প্রায় সময়েই অন্যদের সঙ্গে কড়া কড়া কথা বলে ত্রিলোচন, তার স্বভাব বাবাজীর ঠিক বিপরীত। তার ওপরে এমনিতেই অনেকে সন্তুষ্ট নয়।

তবু রোখের মাথায় উঠে দাঁড়ালো ত্রিলোচন। ছুটে গেল গোয়ালঘরের দিকে। এককালে সেখানে গোরু থাকতো, এখন সেটি শূন্য। সেখান থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসে সে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, বেরোও আমার বাড়ি থেকে, বেরোও ! নইলে আমি....

কাদায় মাখামাখি সারা গা, ত্রিলোচনকে সত্যিই তো পাগলের মতন দেখাচ্ছে !

ত্রিলোচনের বাঁশ দেখেও জনতা ভয়ে পিছিয়ে গেল না। তাদেরও কয়েকজনের সঙ্গে লাঠি আছে। বৃষ্টি শুরু হলে সাপের ভয়ে সন্ধের পর অনেকেই সঙ্গে লাঠি রাখে। গোষ্ঠবিহারীর হাতে রয়েছে থান ইট।

এই বুঝি একটা খুনোখুনি শুরু হয়ে যায় !

দাওয়ার খুঁটিতে হাত দিয়ে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে জ্যামনি। চকিতে একবার সে পাশ ফিরে দেখলো। ত্রিলোচন সঙ্গে করে যে মেয়েটিকে এনেছে, সে কিন্তু হাপুস হুপুস করে ভাত খেয়েই চলেছে, কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

জনতার রোষ থেকে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য ছুটে গেল না জ্যামনি। তার সাত বছরের মেয়ে শ্যামা ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, সে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, ও শামা, যা তোর বাপকে গিয়ে ধর ! বল, হাত থেকে বাঁশটা ফেলে

www.BanglaBook.org

দিতে।

ত্রিলোচন সত্যিই পাগল হয়েছে কি না, এইটাই যেন তার পরীক্ষা।

বাইরে যতই রুক্ষ আর কঠিন হোক ত্রিলোচন, জ্যামনি জানে, মনটি তার স্নেহপ্রবণ। বিশেষ করে এই ছোট মেয়েটিকে সে দারুণ ভালোবাসে। এই মেয়ের সামনে সে একটা খারাপ কথাও উচ্চারণ করে না।

খালি গা, ইজের পরা টিংটিং-এ চেহারার সাত বছরের মেয়ে শ্যামা দৌড়ে গিয়ে ত্রিলোচনের হাঁটু চেপে ধরে কেঁদে বললো, ও বাবা, বাবা গো!

সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচনের চৈতন্য ফিরে এলো। রাগের বশে কারুকে মেরে বসলে তো তাকে জেলে যেতে হবে। কিংবা কেউ যদি তার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়, তাহলে সে কাজে যেতে পারবে না, তার ছেলেমেয়ে খাবে কী? শ্যামা মা'র কত কষ্ট হবে!

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে সে হাত থেকে বাঁশটা ফেলে দিল। তারপর সে গোষ্ঠকে কিছু বলতে গেল কিন্তু কেউ শুনলো না তার কথা। কয়েকজন মিলে ঠেলাঠেলি করে তাকে ঢুকিয়ে দিল গোয়াল ঘরে। তারপর তারা দেয়ালের মতন হয়ে আটকে রাখলো সেই গোয়াল ঘরের মুখ।

গোষ্ঠবিহারী এবার সদর্পে এগিয়ে গিয়ে বললো, ও তিলুর বউ, ডাকিনীটারে উঠানে বার করে দাও!

এবারে একটি কিশোর কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, না, মা দিও না, দিও না! মেরে ফেলবে ওকে!

ত্রিলোচনের চোদ্দ বছরের ছেলে বিষ্টু। মনোহর সাঁতরা শেষ বয়েসে নিজে কোলে করে এই নাতিকে মানুষ করেছে, তাকে কত গল্প কথা শুনিয়েছে। তা ছাড়া বিষ্টু ক্লাস এইটে পড়ে। ইস্কুলে পড়তে পয়সা লাগে না বলে ত্রিলোচন তার ছেলেকে অল্প বয়সেই কাজে লাগায়নি, যতটা পারে পড়াশুনো করুক তার ছেলে।

বিষ্টুর কথা কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না।

জ্যামনি বললো, দিচ্ছি, ওকে উঠোনে বার করে দিচ্ছি, আর দুটো ভাত আছে, শেষ করে নিক। দেখে মনে হয় যেন কতদিন খেতে পায়নি গো!

গোষ্ঠ বললো, তোমার সংসারের সর্বনাশ করতে এসেছে, আর তুমি মায়া ঢালছো! ওরা মোহিনী সাজতে পারে

জ্যামনি বললো, তা বলে কি কারুরে খাওয়ার পাত থেকে জোর করে তুলে

www.BanglaBook.org

দেওয়া যায় ? এই তো হয়ে গেছে !

জলভরা ঘটি রয়েছে পাশেই। সেটা তুলে নিয়ে জ্যামনি বললো, হাত ধুয়ে নাও মা ! ভয় নেই, কিছু ভয় নেই, ওরা যা জিজ্ঞাসা করবে, তার উত্তর দেবে !

মেয়েটি খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে দাওয়ার এক পাশে হাত ধুতে লাগলো। সকলে এক দৃষ্টিতে, গভীর অভিনিবেশে সেই হাত ধোওয়া দেখছে। যেন এর মধ্যেও অলৌকিক কিছু আছে। আঙুলগুলো বেশী লম্বা লম্বা না ? পায়ের গোড়ালি কোন্ দিকে ? ওর শাড়ীতে রক্তের দাগ কেন, আগে কারে খেয়ে এসেছে ?

ঘটিটি নামিয়ে রেখে মেয়েটি এবার জ্যামনিকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কী করে বাড়ি যাবো ?

পুরুষেরা যখন একটা গুরুতর দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়েছে, তখন সেখানে মেয়েদের কথা বলার কোনো অধিকার নেই। জ্যামনির উত্তরটাকে চাপা দিয়ে গোষ্ঠবিহারী হুংকার দিয়ে বললো, বাড়ি যাওয়াচ্ছি তোকে আজ ; সতীশ আর বলাইকে খেয়ে তোর আশ মেটেনি, তুই আবার এসেছিস ? ওরে পাপিষ্ঠা, তুই একবার আমারে পর্যন্ত ভোলাতে চেয়েছিলি !

হাতের ইঁটখানা সে মেয়েটির নাকে ঘষে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড় মারলো মেয়েটি। রান্নাঘরের পাশের ছাই গাদার ওপর দিয়ে সে যেন লাফ মারলো। দু'তিনজন হাত বাড়িয়েও তাকে ধরতে পারলো না, সে প্রাণপণে ছুটলো।

কিন্তু সে কোথায় যাবে, কত দূরে যাবে ?

এঁকে বেঁকে অনেকটাই চলে গিয়েছিল সে, কিন্তু যে-পথটা দিয়ে সে ছুটেছে, তার শেষে দাসবাবুদের বাড়ির দেয়াল ও খিড়কির দরজা। সে দরজাও বন্ধ। তা ছাড়া এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে যাওয়ায় আরও দলে দলে লোক আসছিল, তাদেরই কয়েকজন ঠিক কিছু না বুঝে, একটা মেয়েকে তাড়া খাওয়া চোরের মতন ছুটতে দেখে জাপটে ধরে ফেললো।

বনবিড়ালীর মতন হিংস্র ভাবে আঁচড়ে কামড়েও সে ছাড়া পেল না।

গোষ্ঠবিহারীর আদেশে তাকে আবার আনা হলো ত্রিলোচনদেরই বাড়ির উঠোনে। কেউ কেউ শিবমন্দিরের চাতালে নিয়ে যাবার কথা তুলেছিল, সেখানে বড় জায়গা, সবাই ভালো করে দেখতে পাবে। কিন্তু গোষ্ঠবিহারী সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিল, কেন না, ত্রিলোচনের সামনেই ডাকিনীর খোলস ছাড়ানো দরকার, নইলে ত্রিলোচনও যে মুক্ত হবে না।

www.BanglaBook.org

দু'খানা গামছা দিয়ে হাত ও পা বেঁধে মেয়েটিকে শুইয়ে দেওয়া হলো উঠোনে। কোথা থেকে একটা ন্যাকড়া জুটে গেল কে জানে। ন্যাকড়াটাতে আগুন জ্বেলে পতাকার মতন ওড়াতে ওড়াতে মন্ত্র পড়ে ঘুরতে লাগলো গোষ্ঠবিহারী।

তারপর আগুনটা নিভে গেলে সেই পোড়া ন্যাকড়া অন্য একজনের হাতে দিয়ে বললো, গন্ধ শোকা! নাকের কাছে ঠেসে ধর!

রূপকথার সেই গল্প কে না জানে! রাজার দ্বিতীয় রানী দিনের বেলা ফুটফুটে সুন্দরী সেজে থাকে, আর রাত্তির হলেই তার বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়ে। চোখ দুটো হয়ে যায় ভাটা ভাটা, হাত দু'খানা হয় তালগাছের মতন লম্বা। তখন সে মানুষ ধরে ধরে খায়।

সবাই বোধহয় আশা করেছিল ন্যাকড়ার ধোঁয়া পেলেই হঠাৎ এই যুবতীটি সেইরকম এক সাংঘাতিক রাক্ষসী হয়ে যাবে। কয়েকজন লাঠি উঁচিয়ে রেখেও অবশ্য ভাবছে যে সত্যিই যদি রাক্ষসী হয়, তবে কি তাকে লাঠি-পেটা করে মারা যাবে?

সে রকম কিছুই হলো না, মেয়েটি সেই বিশ্রী গন্ধে বমি করে ফেললো। তার নিম্ন উদর থেকে গলা পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো থরথর করে। একটু আগে যে ক্ষুধার অন্ন একজন গরিবের বাড়িতে বসে খেয়েছিল তৃপ্তির সঙ্গে, তার সবটাই বেরিয়ে গেল, এক দানাও আর রইলো না পেটে।

তারপর সে নেতিয়ে গেল একেবারে। গোষ্ঠবিহারী ন্যাকড়াটা আবার জ্বেলে ছ্যাঁকা দিতে লাগলো তার পায়ের গোড়ালিতে। তবু তার কোনো সাড় নেই। এতক্ষণ বাদে সে জ্ঞান হারিয়ে শান্তি পেয়েছে।

এরই মধ্যে অভুক্ত স্বামীর ভাতের থালাটি আবার ত্রিলোচনকে দিয়েছে জ্যামনি। ত্রিলোচন খেয়েও নিয়েছে। তারপর সে বিড়ি ধরিয়ে দাওয়ায় বসে আছে পা ঝুলিয়ে। তার মুখে আর কোনো ভাষা নেই। ছোট মেয়ে শ্যামাকে সে ধরে আছে এক হাতে। যেন সে বুঝতে পেরেছে, নিজের সন্তানদের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে কেন সে একটা অচেনা পাগল-ছাগল মেয়ের জন্য এতখানি মাথা ঘামাতে গিয়েছিল! ওরা যা ইচ্ছে তাই করুক।

বৃষ্টির দিনে সন্ধেবেলা আর তো কিছুই করার নেই, সবাই তাই বেশ মজা পাচ্ছে। বেশ বড় রকমের একটা উত্তেজনার এবং অনেকদিন ধরে গল্প করার মতন একটা ব্যাপার।

www.BanglaBook.org

তবে এই ডাকিনী যদি অল্প বয়েসী যুবতী না হয়ে বুড়ি-ধুড়ী হতো ? কিংবা, এটা যদি হতো কোনো ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের কাণ্ড ? তাহলে অনেক আগেই লোকে হেসে উড়িয়ে দিত। আজকাল গ্রামের মানুষও ওসবে ঠিক বিশ্বাস করে না, বিশেষত অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকলে। কিন্তু ডাকিনী-যোগিনী-মায়াবিনী অন্য ব্যাপার !

অবশ্য গোষ্ঠবিহারীর ওপর আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। সে অনেকক্ষণ ধরে কী সব আবোল তাবোল চেঁচিয়ে যাচ্ছে, কিছুই তো ঘটছে না তাতে। মেয়েটার জ্ঞানও ফিরছে না। আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরা যায় ? এদিকে ক্রমেই নতুন নতুন লোক আসছে, তাদের কাছে গল্পটা বারবার বলার একটা সুখ আছে।

মাঝখানে কিছুক্ষণ জোর বৃষ্টি নামায় সবাই রান্নাঘর, গোয়ালঘর আর ত্রিলোচনের দাওয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। উঠোনে পড়ে ভিজতে থাকলো মেয়েটা। তাতে তার বমি টমি ধুয়ে গেল, ভিজে শাড়ীতে শরীরের রেখা স্পষ্ট হলো। সবাই ভেবেছিল, এত বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে নিশ্চয়ই ওর জ্ঞান ফিরবে।

তাও তো হলো না। বৃষ্টি থামবার পর গোষ্ঠবিহারী আবার মেয়েটিকে ঘুরে লাফাতে শুরু করেছে, কিন্তু তার গলায় আর সেই জোর নেই। গোষ্ঠবিহারী বোধহয় সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে সে ডাকিনীদের বশ করার মন্ত্র জানে, সে কালীসাধক, প্রেতযোনীরা তাকে সমীহ করবেই। তার সে বিশ্বাস যেন একটু একটু টলে যাচ্ছে।

দু'একজন বললো, শিবমন্দিরের পুরুত মুরারি ঠাকুরকে ডাকলে হয় না ? তিনি নিশ্চয়ই অনেক মন্ত্র জানবেন ? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে মুরারি ঠাকুরের বয়েসের গাছ পাথর নেই, চুরাশি-পঁচাশি তো হবেই, তিনি কি বৃষ্টি বাদলার মধ্যে বেরুতে চাইবেন ?

মুরারি ঠাকুরের নাম শুনেই গোষ্ঠবিহারী আবার দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলে উঠলো। সে কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। একবার সে হার মানলে গ্রামের মানুষ কোনোদিন আর তাকে পুঁছবে না। আড়ালে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এ গ্রামের মানুষদের তার খুব চেনা আছে।

সে বললো, একখান লোহার শিক গরম করে আনতো। ওর জেহ্বায় ছ্যাঁকা দিয়ে এমন একটা মোক্ষম মন্তর ঝাড়বো ! বুঝলি না। এ বেটি মটকা মেরে আছে আমি একটু অন্যমনস্ক হলেই বাতাসে মিলিয়ে যাবে !

একজন কেউ বললো, দেখো গোষ্ঠদাদা, বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলো না।

www.BanglaBook.org

শেষ অব্দি থানা-পুলিশ করতে না হয় !

এই সময় বাবাজী এসে পৌঁছোলো সেখানে। সে ভিড় ঠেলে সামনে এগোবার আগেই বিষ্টু তাকে ধরে ফেলে বললো, কাকা, এ মেয়েটা ডাকিনী নয় গো !

বিষ্টুকে একটু দূরে টেনে নিয়ে বাবাজী সব শুনলো। তার চোখ দিয়ে জল এসে যায় প্রায়। ত্রিলোচন এতখানি করেছে, একটা অচেনা দুঃখী মেয়ের জন্য ? আর সে কী করেছে সারাজীবন, এ পর্যন্ত কারুর কোনো উপকারে লেগেছে ?

সে বিষ্টুকে চালের পুটুলিটা হাতে দিয়ে বললো, তুই থাক এখানে। আমি আসছি। মেয়েটার জিভে ছ্যাঁকা দিলে ও মরে যাবে রে। গোষ্ঠ ছ্যাঁকা দিতে গেলেই তুই চেঁচিয়ে বলবি, পুলিশ ! পুলিশ ! পুলিশে খবর দাও !

বাবাজী আবার পেছন ফিরে ছুটলো। খোঁড়া পায়ে সে জোরে সাইকেল রিক্সা চালাতে পারে বটে কিন্তু জোরে দৌড়েতে পারে না। তবু সে যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়োতে লাগলো।

যুবতীটি শুয়ে আছে প্রায় নিঃস্পন্দের মতন। কেউ কেউ তার বৃষ্টি ভেজা শরীরটির বিশেষ বিশেষ অংশের প্রতি চোখ নিবদ্ধ রাখতে গিয়েও হঠাৎ হঠাৎ শিউরে উঠে ভাবছে, মরে গেল নাকি ? মৃত দেহ আর মাটির মূর্তি একই রকম, তাদের দিকে তাকাবার সময় লোভের জেল্লা থাকে না। একটা অচেনা স্ত্রীলোক এসে এ গ্রামের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে কি গো, তা হলে যে পুলিশের হুজ্জোত হবে ! না, না, ও মেয়ে নয় ডাকিনী, ডাকিনীদের মৃত্যু হয় না !

গোষ্ঠবিহারী চিৎকার করতে লাগলো, কই, একজন একটা লোহার শিক গরম করে আনো !

অতটুকু ছেলে বিষ্টু, সে আর কী করে বাধা দেবে ? জ্যামনির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো, আমাদের বাড়িতে লোহার শিক নেই ! জ্যামনি মাথা নাড়লো।

তবু একজন অত্যুৎসাহী ছুটে অন্য বাড়ি থেকে নিয়ে এলো একটা ভাঙা চিমটে। এই চিমটে পুড়িয়েও ছ্যাঁকা দেওয়া যায়।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কাঠের আগুন জ্বেলে সেই চিমটে গরম হতে লাগলো।

এরই মধ্যে মেয়েটা একবার পাশ ফিরতেই শোনা গেল আর এক দফা চিৎকার। বেঁচে আছে, তা হলে এখনো মজা জমবে !

ত্রিলোচন উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। তার শরীরে আবার রাগ আসছে,

www.BanglaBook.org

কিন্তু অক্ষম ক্রোধে মানুষের কষ্ট বাড়ে। এই জনতার বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারবে না!

বিষ্টু ছটফট করছে উত্তেজনায়। সে এখনো নারী-শরীর চিনতে শেখেনি, তাই এই অত্যাচারটাকে তার মনে হচ্ছে যথার্থ অন্যায়, সে খালি তাকিয়ে দেখছে পথের দিকে। বাবাজী কোথায় গেল, কখন ফিরে আসবে? গোষ্ঠবিহারী মেয়েটির গায়ে ছ্যাঁকা দিতে গেলেই সে প্রাণপণে পুলিশ পুলিশ বলে চ্যাঁচাবে!

ভাগ্য শুধু মানুষকে নিয়ে কৌতুকই করে না, অনেক সময় পথেরও ইঙ্গিত দেয়। আজ সন্ধে পর্যন্ত বাবাজী জানতো না যে এ গ্রামের কাছাকাছি কোনো পাশ করা ডাক্তার আছে। আর ভাগ্যের জোরে আজই কি না সে সেই ডাক্তারকে নিজের রিকশায় সওয়ারি করে নিয়ে এসেছে! ছোকরা ডাক্তারবাবুটি নিজের মুখে বলেছে, যখনই কোনো দরকার হবে, আমার কাছে চলে আসবে। যে-কোনো সময়ে।

নিয়তির খেলা রে ভাই বোঝা বিষম দায়
চক্ষু বেঁধে ঘুরায় যেন গোলোক ধাঁধায়
আহা বোঝা বিষম দায়
অচেনা সে কন্যার যবে মরণের দশা
ডাকিনী বলিয়া সবে করিল বিবশা
আহা মরণের দশা
হেনকালে উপজিল রুদ্র মূর্তি ধরি
কলিকাতার ডাক্তার এক নবেন্দু চৌধুরী
আহা রুদ্র মূর্তি ধরি
জয় জয় বোম ভোলা, জয় জয় বোম ভোলা.....

॥ ৪ ॥

নিম গাছটার তলায় পরপর চারটে খাটিয়া পাতা। আজ সকালেও জোর এক পশলা বৃষ্টির পর বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। লুঙ্গি পরে, খালি পায়ে খাটিয়াগুলোতে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে চার জন। এর মধ্যে জিন্দালের শিয়রের কাছে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও-তে গান বেজেই চলেছে, জিন্দালেরই নাক ডাকছে সবচেয়ে জোরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিমগাছটার উঁচু ডালে এসে বসেছে একটা ইষ্টকুটুম পাখি। ফর্সা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক সারি বক। একটু বাতাস দিলেই পাশেই তেঁতুল গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে কুচি কুচি পাতা।

স্টোর রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুপুরুষ ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং, তার অঙ্গে একেবারে পুরোদস্তুর ফিটফাট পোশাক। ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিংকে কখনো খালি গায়ে দেখা যায় না। খাঁকি প্যান্ট, খাঁকি শার্ট দুটোই বেশ ইস্ত্রী করা, মাথার পাগড়িতে সামান্য ময়লা নেই, কোমরবন্ধে পিস্তল, চোখে সান গ্লাস, পায়ের জুতোতে ঝকঝকে পালিশ। ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং বেশ লম্বা। হাত বাড়িয়েই সে পেঁপে গাছ থেকে পেঁপে ছিঁড়তে পারে।

এখন ক্যাপ্টেন সাহেবের চোখে সান গ্লাসের বদলে দূরবীন, সে খুব মন দিয়ে ইষ্টকুটুম পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করছে। পাখিটার মুখের দিকটাই ঢাকা পড়ে গেছে পাতার আড়ালে। পাখিটা এক ডাল থেকে অন্য ডালে গিয়ে উড়ে বসলো, ঠুকরে খাচ্ছে নিম ফল, কিন্তু কিছুতেই সে পুরোপুরি দেখা দেবে না ঠিক করেছে যেন। ক্যাপ্টেন সাহেব নিজের কান দুটোকে খাড়া করে রেখেছেন, যদি একবার পাখিটার ডাক শোনা যায়।

হঠাৎ সে মিষ্টি একটা শিস শুনতে পেল। কিন্তু এটা অন্য পাখি। খুব কাছেই পেঁপে গাছের নীচে, পাখিটার পিঠটা বেশ তেল চুকচুকে কালো, দু' পাশে সাদা দাগ, লেজটি উঁচু করে তোলা। ভারি সুন্দর এদের ডাক, একটা দেখা গেলেই কাছাকাছি আর একটা থাকে, দু'জনে পালা করে ডাকে। কিন্তু অন্যটা কোথায় ?

ক্যাপ্টেন সাহেবের হঠাৎ খেয়াল হলো, যত নষ্টের গোড়া ওই জিন্দালের রেডিওটা। ওটা শুধু শুধু বাজছে বলেই কোনো পাখির ডাকই ভালো করে শোনা যাচ্ছে না। রেডিওটা বন্ধ করা দরকার, কিন্তু বারান্দা থেকে নামতে গেলেই যদি পাখিটা উড়ে যায় ?

একটা সাইকেল রিকশার ছ্যাড় ছ্যাড় শব্দে ক্যাপ্টেন সাহেবকে মুখ তুলে অন্যদিকে তাকাতে হলো। পাকা সড়কটার শেষ প্রান্তে এসে থামলো সেটা। রিকশায় একজনই মাত্র যাত্রী, ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং দূরবীনে লোকটিকে দেখলো এবং চিনতে পেরে খুশী হলো।

পাখি দেখা বন্ধ রেখে সে বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তারপর বাঙালী কায়দায় কপালের কাছে দু'হাত তুলে বললো, আসুন, আসুন ডাক্তার সাহেব, কী খোবর ?

www.BanglaBook.org

নবেন্দু ডাক্তারও হাসি মুখে নমস্কার জানিয়ে বললো, আপনার খবরই তো নিতে এলুম। কেমন আছেন ?

ক্যাপ্টেন বললো, ভালো আছি। কোনো গড়বড় নেই। আপনি রিকশাওয়ালাকে বলুন, গেট ছেড়ে ফাইব হান্ড্রেড ইয়ার্ডস দূরে গিয়ে বসতে। আপনি যখন ফিরবেন, ওকে কল্ করবো।

নবেন্দু চৌধুরী বাবাজীকে সেরকম নির্দেশ দিতে ফিরে গেল। বাবাজী প্রায় হাঁ-করা চোখ মেলে চেক পোস্টের কোয়ার্টারগুলো দেখছে।

ক্যাপ্টেন পরমজিৎ মুখ তুলে একবার ইষ্টকুটুম পাখিটাকে খোঁজবার চেষ্টা করলো। সেটা নেই, কিন্তু পেঁপে গাছের নীচে দোয়েল পাখিটা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন সাহেব সেদিকে আঙুল তুলে দেখাতেই ডাক্তার সাহেব বললো, ওটা তো কমন্ দোয়েল। এই দোয়েল পাখি বাংলায় খুব দেখা যায়। এগুলোর ইংরিজি নাম ম্যাগপাই রবিন। এরকম চমৎকার শিস আর কোনো পাখি দিতে পারে না।

দোয়েল পাখিটা যেন এই কথা শুনতে পেয়েই লজ্জায় উড়ে চলে গেল।

ওরা দু'জনেই সেই পাখিটার উড়ে যাওয়া দেখলো।

তারপর ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলো, টেইলর বার্ডকে বাংলাতে কী বোলে, তা আপনি জেনেছেন ? ওরাও খুব সুইট ডাকে, ছোট্ট পাখি।

ডাক্তার বললো, আপনার ডেসক্রিপশন শুনে ঠিক বুঝতে পারিনি, আপনি ইংরিজি নাম বললেন টেইলর বার্ড, এই নামটা শোনা শোনা। কলকাতায় আমার বাড়িতে গিয়ে ডিকশনারিতে দেখি, ও হরি, এ তো আমাদের টুনটুনি। ওয়ার্বলার গ্রুপের পাখি, ওরা সুতো, ন্যাকড়া, তুলো এইসব মুখে করে এনে বাসা বানায় বলেই বোধহয় কিপলিং এদের নাম রেখেছিলেন দর্জি পাখি।

ক্যাপ্টেন বললো, আজ নিমগাছে একটা অন্যরোকম পাখি এসেছিল, টেইলটা অনেক লম্বা, ইস, আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

ডাক্তার বললো, বার্ড ওয়াচিং-এর এটাই তো মজা। পাখিরা আমাদের ইচ্ছেমতন এক জায়গায় বসে থাকে না। চলুন ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনার পা-টা একবার দেখবো।

ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং-এর নিজস্ব ঘরটাও ছিমছাম ভাবে সাজানো। দেয়ালে দুটি মাত্র বাঁধানো ছবি। গুরু নানক ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। খাটের ওপর সাদা চাদরটা ধপধপে, মশারিটা গুটিয়ে রাখা। ঘুম থেকে উঠেই সে নিজের

www.BanglaBook.org

ঘরখানা গুছিয়ে ফেলে।

ডাক্তারের জন্য একটা বেতের চেয়ার টেনে দিয়ে পরমজিৎ বিছানায় বসে ডান পায়ের জুতোয় ফিতে খুললো। ঐ এক পায়ের মোজাও খুলে ফেললো সে। তার ফর্সা পাখানাতে এক ছিটেও ময়লা নেই। গোড়ালির কাছে সরু ব্যাণ্ডেজ।

নবেন্দু চৌধুরী পরমজিতের সেই পায়ের পাতাটা নিজের দু'হাতে তুলে নিল।

একদা যে রাজ্য ছিল সকল বাঙ্গালীর
ছুরি দিয়ে দুইখান হলো মাটিতে রুধির
আহা সকল বাঙ্গালীর
সেপাইগণে টহল মারে সীমান্ত এলাকা
কেহ বলে চুঙ্গি, চেকপোস্ট, কেহ বলে নাকা
আহা সীমান্ত এলাকা
সেথাকার প্রধান ক্যাপ্টেন, সাহসের নাই জুড়ি
বিষধর সর্প লয়ে আকাশে দ্যান ছুড়ি
আহা সাহসের নাই জুড়ি...

কয়েকদিন আগে, রাত প্রায় পৌনে একটায় এই ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং হাজির হয়েছিল হেল্‌থ সেন্টারে। ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে উঠতে ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরীর আপত্তি নেই, সে এখনো বিয়ে করেনি। কিন্তু সে রাতে সে রুগীটিকে দেখে অবাক।

পরমজিৎ সিং পারতপক্ষে পা থেকে জুতো খোলে না। সেইরাত্রে তার ডিউটি ছিল না। তার ঘুমোবার পালা। মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে সে একবার জল ছাড়তে গেল, তখন তার খালি পা ছিল, তাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাজটি সারলে কোনো বিপদ হতো না, কিন্তু সে উঠোন পেরিয়ে যেতে গেল বাথরুমের দিকে। মাটিতে নামতেই প্যাট করে তার পা পড়লো একটা সাপের গায়ে, সে সাপও প্রাণের দায়ে দংশন করলো তাকে।

পরমজিৎ রাতে টর্চ নিতে ভোলেনি, কিন্তু ঘুম চোখে সে টর্চের আলোতেও সাপটিকে লক্ষ করেনি। অবশ্য কমাণ্ডো ট্রেনিং আছে তার, পায়ে কিছু একটা কামড়াতেই সে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল এবং সেই তিন ব্যাটারির লম্বা টর্চ দিয়ে সে আঘাত করলো সাপটার মাথায়।

সাপটা পালাতে পারেনি।

www.BanglaBook.org

সেই অবস্থাতে তেমন কিছু বিচলিত না হয়ে পরমজিৎ ঘরে ফিরে এসে প্রথমে একটা গামছা ছিঁড়ে তার ডান পায়ে শক্ত তিন বাঁধন দিল নিজে নিজে। তারপর রান্নাঘর থেকে ডেকে তুললো লটকাকে। কখনো বেশী রাত হয়ে গেলে লটকা ওখানেই ঘুমিয়ে থাকে। চেক পোস্টে তার রাত্তিরে থেকে যাওয়ার আরও কারণ আছে।

টর্চের বাড়ি খেয়েই সাপটা অর্ধমৃত হয়েছিল, রান্নাঘর থেকে একটা সাঁড়াশী নিয়ে পরমজিৎ সেটাকে ধরে তুললো। তারপর লটকাকে বললো চল। তোদের গ্রামের হেল্‌থ সেণ্টারে ডাক্তার এসেছে শুনেছি!

নবেন্দু ডাক্তারকে দেখে পরমজিৎ সিং প্রথমেই বলেছিল, ডাক্তারবাবু, আগে বলুন এই সাপটা কি পয়জনাস?

নবেন্দু ডাক্তারের প্রথম নজরেই মনে হয়েছিল, এই না হলে শিখ? এই জন্যই তো ইণ্ডিয়ান আর্মিতে শিখদের এত প্রাধান্য। বাঙালীদের কক্ষনো এত সাহস হবে? সাপে কামড়াবার পরেও লোকটা এতখানি রাস্তা ছুটে এসেছে, সঙ্গে আবার জ্যান্ত সাপটাকে সাঁড়াশী দিয়ে ধরে এনেছে!

হলুদের ওপর কালো ছিট, বেশ মোটা হাত তিনেক লম্বা সেই সাপ। কোন্ সাপ বিষাক্ত আর কোন্‌টা নির্বিষ, তা নবেন্দু চৌধুরী ভালো চেনে, তবে সাপ দেখলে ভয়ে তার গা শিরশির করে।

ভাগ্যিস তার কাছে অ্যাণ্টি স্নেক ভেনাস সিরাম ছিল, সে আগেই একটা ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দিল। তারপর ক্ষতস্থান খুলে দেখলো, দাঁতের দাগ মাত্র একটা। তাতে কিছুই বোঝা গেল না।

সে পরমজিৎকে ধমক দিয়ে বলেছিল, আর্মিতে কাজ করেন আর এইটুকু জানেন না যে সাপে কামড়ালে হাঁটতে বা দৌড়তে নেই, তাতে বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে! এক্ষুণি শুয়ে পড়ে আমাকে ডেকে পাঠানো উচিত ছিল।

পরমজিৎ শান্ত গলায় বলেছিল, মিড নাইটের পর কল দিলে কোনো ডাক্তার কি যায়? আপনি দো-তিন ঘণ্টা বাদ গেলে আমার জান বাঁচতো? আমি বুঝেছিলাম কী, এ সাপটা পয়জনাস হলে আমার বাঁচার চান্স কম। আমি সেইটুকু চান্স নিতেই এসেছি। এখন ইয়াদ হচ্ছে কী, এ সাপটা নন পয়জনাস। আমার নিদ আসছে না। ছেড়ে দিন শালাকে, ও ঝাণ্ড ধরে খাক। ওকে মেরে কি হবে? জওয়ান পাঠ্যে কখনো নিরীহ প্রাণীকে মারে না!

সেই থেকে রটে গেল যে চেক পোস্টের ক্যাপ্টেন সর্দারজী বিষাক্ত সাপ

www.BanglaBook.org

নিজের হাতে ধরে খেলা করতে পারে। হেল্‌থ সেণ্টারের মেল নার্স যতীন অবশ্য বলেছিল যে ওটা একটা জল ঢোঁড়া, কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। বরং লটকা এই কাহিনীকে আরও রোমাঞ্চকর করে ছড়িয়েছে।

পরদিন বিকেলে নবেন্দু ডাক্তার নিজেই চেক পোস্টে ক্যাপ্টেন পরমজিতকে দেখতে এসেছিল। বিষাক্ত হোক বা না হোক, সাপের কামড় খেয়েও যে এই তরুণ শিখ যুবকটি একটুও বিচলিত হয়নি, এটা দেখেই সে চমৎকৃত হয়েছিল। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, আগের রাত্রে যাকে সাপে কামড়েছে, পরের দিন বিকেলে সে বারান্দায় বসে দূরবীণ দিয়ে পাখি দেখছিল। সাপের বদলে সে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে পাখি বিষয়ে। পরমজিতের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল।

আজ সে পরমজিৎকে দ্বিতীয়বার দেখতে এসেছে।

পা-টা একটুও ফোলেনি, ক্ষতস্থানটা প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। সাপটা বিষধর হোক বা না-ই হোক, ঠিক মতন দাঁত বসাতে পারেনি, সেটাই পরমজিতের ভাগ্য।

নবেন্দু জিজ্ঞেস করলো, আপনার ভমিটিং টেণ্ডেন্সি আর নেই তো? ঠিকমতন খিদে টিদে হচ্ছে?

পরমজিত বললো, বিলকুল সব নর্মাল।

নবেন্দু বললো, শুয়ে পড়ুন। আপনার ব্লাড প্রেশারটা একবার দেখবো। আগের দিন আপনার প্রেসার খুব হাই ছিল। স্নেক বাইটের পরেও কী করে আপনি এতখানি রাস্তা ছুটে গেলেন। আমি এখনও আশ্চর্য হয়ে ভাবছি।

বিছানায় মাথা হেলিয়ে দিতে দিতে পরমজিত বললো, পাঞ্জাবের এক ভিলেজে আমার মা আমার জন্য বসে থাকেন, আমি ঝটাক্‌সে মরে গেলে চলবে কী করে? মায়ের আগে ছেলের মরতে নেই।

নবেন্দু হেসে উঠলো। এটা একটা অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা। হাসি ছাড়া এর ওপর আর কোনো মন্তব্য চলে না।

প্রেসারও অনেক নেমে গেছে, আর চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

উঠে বসে পরমজিত বললো, আপনি তো ফি নিবেন না। আপনার সাইকেল রিক্সার ভাড়াটা আমি মিটিয়ে দিতে পারি?

হাত নেড়ে নবেন্দু বললো, রাখুন তো, ঐ সামান্য ব্যাপার। আপনি মশাই পাঞ্জাবের লোক হয়ে এত ভালো বাংলা শিখলেন কী করে? এখানে কতদিন

www.BanglaBook.org

এসেছেন ?

—এখানে এসেছি আট মাস। কিন্তু আমি তো কলকাতার ছেলে।

—আপনি কলকাতার ছেলে ?

—হ্যাঁ, ভবানীপুরে গাঁজা পার্কের পাশে থেকেছি। চোদ্দ বোছর বয়েস পর্যন্ত কলকাতায় ইস্কুল গিয়েছি, বাংলা বইও পড়তে পারি। আপনি যদি জন্ম থেকে অমৃতসরে থাকতেন, ইস্কুলে যেতেন, আপনি পাঞ্জাবী ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে যেতেন না ?

—তা ঠিক, আমার বাড়িও কলকাতার কালিঘাটে। গাঁজা পার্কের পাশে এখনও অনেক পাঞ্জাবী থাকে দেখেছি।

—কলকাতার ইস্কুলের ছেলেরা আমাকে বলতো পাঁইয়া, বাঁধাকপি। লেকিন অনেক ভালো বন্ধু ছিল !

—কলকাতা থেকে চলে গেলেন কবে ?

—আমার বাবার একটা মোটর পার্টস-এর দোকান ছিল। ভবানীপুরে একটা খুব বড়ো মিষ্টির দোকান আছে না, তার ঠিক ডানপাশে। আমার বাবা মার্ডার হবার পর আমাদের কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলো। ভিলেজে আমাদের কিছু খেতি-জমি ছিল, তাই দিয়ে মা কোনোরকমে চালালেন। স্কুল পাশ করে আমি আর্মিতে ঢুকে গেলাম।

মার্ডার কথাটা শুনলেই তার মধ্যে একটা গল্পের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু পরমজিত এমনভাবে বললো, যেন তার বাবা মারা গেছে সর্দি-কাশিতে। তবু নবেন্দু কৌতূহল চাপতে পারলো না। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাবা খুন হয়েছিলেন ?

পরমজিৎ জুতো পরতে পরতে বললো, 'ড্যাডিজি খুব হট টেম্পারড পার্সান ছিলেন। কে যে মার্ডার করলো, কালপ্রিট ধরা পড়লো না। ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল চন্দননগরে রেল স্টেশনের দিকে, কেন সেখানে গিয়েছিলেন তাও জানি না। আমার দুটো আংকল ছিল, তাদের সাথে ঝোগড়া ছিল। একটা আংকল তো হিন্দী সিনেমার ভিলেন অমরীশ পুরীর মতন ঠিক। বাবা মরে যাবার পর সেই আংকল দুটো আমাদের দোকানটা গাপ করে দিল। আমাদের আর কলকাতায় থাকা হলো না। আমার আরও তিনটা সিস্টার ছিল। তার মধ্যে বড়া বহিনের বয়েস তখন উনিশ...

বাবার হত্যার কথা বলতে পরমজিতের গলা একটুও কাঁপেনি, কিন্তু তার

www.BanglaBook.org

দিদির প্রসঙ্গ আসতেই সে চুপ করে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে রইলো মাটির দিকে। হয়তো তার বড় বোনের বিষয়েও কোনো করুণ গল্প আছে।

কিন্তু সে গল্পের বিষয়ে কৌতূহল দেখানো ভদ্রতাসম্মত নয়, ডাক্তারের নিজেরই এখন কিছু বলবার আছে।

সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালো। পরমজিত নিজে ধূমপান করে না, কিন্তু আগের দিনই ডাক্তার জেনে গিয়েছে যে তার সামনে অন্য কেউ সিগারেট টানলে তার আপত্তি নেই।

নবেন্দু জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ক্যাপটেন সিং, একটা কথা জানতে চাই, এই যে বর্ডারের চেক পোস্ট আপনারা সামলাচ্ছেন, এখান দিয়ে বিনা পাসপোর্টে যদি কেউ ঢুকে পড়ে, তাহলে আপনারা তাকে নিয়ে কী করেন ?

পরমজিত বললো, উইথ পাসপোর্ট আর উইদাউট পাসপোর্ট, কোনো ফারাক নেই, এখান দিয়ে আমরা কোনো মানুষকেই বর্ডার ক্রশ করতে দিই না। ইউ সি, এটা রেগুলার চেকপোস্ট তো না, এটা ওয়াচ পোস্ট, এদিককার বর্ডার দিয়ে যাতে কেউ যাওয়া আসা না করে, সেটা দেখাই আমাদের ডিউটি। ভ্যালিড পাসপোর্ট নিয়ে লোক যাওয়ার জন্য কাছাকাছির মধ্যে চেকপোস্ট গেট আছে নদীয়ায়। কেন, আপনি ওপারে যাবেন নাকি ?

—নাঃ, আমার আপাতত সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, কিছু লোক তবু তো ওদিক থেকে, এদিক থেকে বর্ডার ক্রশ করছে ? তাদের ধরাটাও আপনাদের ডিউটি নিশ্চয়ই। তাদের ধরার পর আপনারা কী করেন ?

—আপনার কোনো রিলেটিভ উইদাউট পাসপোর্ট চলে এসেছে বাংলাদেশ থেকে ?

—না, আমার সাত পুরুষের কেউ বাংলাদেশে কখনো থাকেনি। এটা আমার নিছক কৌতূহল বলতে পারেন।

—ডাক্তারসাব, আমাদের ওপর অর্ডার আছে, ঐ সাইড থেকে কেউ ইণ্ডিয়ায় ঢুকার চেষ্টা করলে তাকে ঠেলে ফিরৎ পাঠাতে হোবে। তবু যদি কেউ ঢুকে পড়ে তো তাকে অ্যারেস্ট করবো।

—অ্যারেস্ট করার পর তাকে কোথায় রাখেন ?

—থানায় হ্যাণ্ড ওভার করে দিই। তারপর পুলিশের রেসপনসিবিলিটি। পুলিশ তাদের কোর্টে প্রোডিউস করবে কি না করবে, সেসব সিভিল

www.BanglaBook.org

অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের কারবার। তবে কি জানেন, অনেক সময় দল দল মানুষ দেখলেও আমি আঁখ ফিরিয়ে থাকি, অ্যারেস্ট করি না। দেখলেই বোঝা যায়কি, তারা খেতে পায় না। ক্ষুধার জন্য ছুটছে। ডাক্তারসাব, বাংলাদেশী বলুন আর ওয়েস্ট বেঙ্গলই বলুন, এমন রোগা রোগা, এমন শুকনো চেহারার মানুষ আমি পাঞ্জাবের গ্রামে কখনো দেখিনি। এখানে মানুষ দু'বেলা খেতেই পায় না। আপনি পাঞ্জাবের ভিলেজে গিয়ে দেখে আসুন। অনেক চাষার বাড়িতে ফ্রিজ আছে, টি ভি আছে! আর এখানে? আমার কোষ্টো হয়। পেটের জ্বালায় মানুষ বর্ডার মানবে কী?

—আপনি তা হলে অনেককে ছেড়ে দেন?

—ডোন্ট কোট মি। এসব কথা আপনাকে আন অফিশিয়ালি বলছি।

—আপনি যাদের ছেড়ে দেন, তাদের মধ্যে তো স্মাগলারও থাকতে পারে?

—স্মাগলারদের কথা আলাদা। বিলকুল আলাদা। এরকম সফ্ট বর্ডার থাকলে স্মাগলিং হবেই। ডিমাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর ব্যাপার। আপনি মনে করুন, বর্ডারের ওধারের ডিস্ট্রিক্টে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। তখন এদিক থেকে চিনি যাবে না? আলবাৎ যাবে। ওদের ওদিকে মাছ বেশি উঠলো, তা এদিকে আসবে না? কে এইসব আটকাবে? এতবড় বর্ডার, সব কিছু চেক করবো, এমন ম্যান পাওয়ার কি আমাদের আছে? ইমপসিবল। আমি কী করি জানেন? মাসে অন্তোতো বারোজন স্মাগলারকে ধরি। কিছু না ধরলে, আমার উপরওয়ালা ভাববে আমি করাপ্ট। আমাকে হুড়কো দিবে। মাসে দশ-বারোটা কেস ধরে দিলেই গুড রেকর্ড। তারপর যতখুশি স্মাগলিং হোক, গভর্নমেণ্ট খুশী। প্রেস খুশী। স্মাগলার শালারাও এতে খুশী।

—ক্যাপ্টেনসাহেব, এবার আসল কথাটা বলি। ধরুন, একজন কেউ বিনা পাসপোর্টে বর্ডার ক্রস করে এদিকে চলে এলো। এখানকারে কোনো গ্রামের বাড়িতে রইলো। আপনি যদি সে খবর পেয়ে যান, তখন কি গ্রামে ঢুকে তাকে অ্যারেস্ট করবেন?

—নো, নট অ্যাট অল! আমার ভারি দায় পড়েছে। সেটা থানা-পুলিশের ডিউটি। আমরা গ্রামে এন্টার করি না। সিভিল লাইফের সঙ্গে আর্মির মিলমিশ এনকারেজ করা হোয় না। আপনি কারুকে ধরাতে চান তো বলুন, থানার ওসিকে আমি খোবর দিতে পারি।

—এখন দুপুর দেড়টা বাজে। দেখলুম, বাইরে খাটিয়া পেতে চারজন

www.BanglaBook.org

ঘুমোচ্ছে। আপনি আছেন এই ঘরের মধ্যে। এখন বর্ডার কে পাহারা দিচ্ছে ? আপনার আর কতজন লোক আছে ?

—এই চেক পোস্টে আমার বারোজন স্টাফ। তার মধ্যে একটা লোক ছুটিতে ঘর গেল। চারজন ঘুমোচ্ছে, ওদের নাইট ডিউটি ছিল। দু'জন রসুই ঘরে খানা পাকাচ্ছে। পিছন দিকে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে দেখেছেন তো ? সেটার উপরে একজন বসে আছে। আর চারজন ডে ডিউটিতে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। সেখানে যদি তারা ঘুমোয়, আমার কিছু করবার নেই। আমি মাঝেমাঝে টহল দিতে যাই। ব্যাস্ !

—ওপার থেকে যদি কারুকে খুন করে এপারে ফেলে রেখে যায় ?

—ডাক্তারসাব, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। এ রকম কত ডেডবডি নদীর জোলে ভেসে যায়। আমরা রিপোর্টও করি না। রিপোর্ট করলে সেই ফালতু ঝামেলা। কিন্তু আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?

ডাক্তার ক্যাপটেনের চোখের দিকে সরাসরি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। যেন সে ক্যাপ্টেনের কপাল ফুঁড়ে তার মগজ পর্যন্ত দেখতে চাইছে।

ক্যাপ্টেন চোখ সরালো না। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট হ্যাপেন্‌ড ? আপনি মিস্ট্রি রেখে দিচ্ছেন।

ডাক্তার বললো, একটি মেয়ে···বছর বাইশ তেইশ বয়েস হবে। হিন্দু মেয়ে, ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল···তার মাথার একটু গোলমাল হয়ে গেছে, ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। তবু যেটুকু বোঝা গেল, এই বর্ডারের কাছে তাকে কেউ ধরেছিল।

—কে ধরেছিল ?

—তার কথা শুনে মনে হলো, কোনো ইউনিফর্ম পরা লোক, আপনার মতন

—আমার লোক তাকে ধরেছিল ? আমার কাছে তো সেরকম কোনো রিপোর্ট নেই ! কেউ কিছু বলেনি। ওপারের বাংলাদেশ বর্ডারের কোনো গার্ড হতে পারে। ওরা এক দু'জন মানুষ ধরলে জিনিসপোত্র সব কেড়ে নিয়ে এদিকে ঠেলা মেরে দ্যায়।

—মেয়েটির সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে।

—হিন্দু মেয়ে বললেন তো ? ওরা আটকায় না, শুধু সঙ্গে দামি চিজ কিছু থাকলে গাপ করে।

—যে ঐ মেয়েটিকে ধরেছিল, সে হিন্দিতে কথা বলছিল। বাংলা জানে না।

www.BanglaBook.org

ওপারের বাংলাদেশী গার্ডরা হিন্দী বলবে কেন ?

—ওরা কেউ কেউ উর্দু জানে। পাকিস্তান জমানায় শিখেছে, আমার সাথেও উর্দুতে বাৎচিৎ করে এক এক সময়। আপনার ঐ বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে হিন্দী উর্দুর ডিফারেন্স কী বুঝবে ? যাই হোক, সে চলে এসেছে, এখন তাকে নিয়ে কী করতে চান ?

—শী ওয়াজ রেপ্‌ড। অ্যাট লিস্ট টোয়াইস !

ক্যাপটেন পরমজিত সিংয়ের হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ফারিত হলো চোখ, ঠোঁটের ভঙ্গিতে ফুটে উঠলো একটা ক্রূর ভাব।

উঠে দাঁড়িয়ে সে কর্কশভাবে বললো, ডাক্তার চৌধুরী, আপনি আমাদের নামে অ্যালিগেশন দিতে এসেছেন ইখানে ? রেপ ? আমি এরকম কথা একদম বরদাস্ত করবো না। ইউ মাস্ট উইথড্র ! আমি জানি কি বর্ডার চেক পোস্টের গার্ডদের নামে অনেক বোদনাম হয়। তারা ঘুষ খায়, তারা স্মাগলারদের কাছ থেকে বখরা পায়। তারা ইললিগ্যাল ইমিগ্রেশান চেক করে না ! এসব কিছু আমি পুরোপুরি ডিনাই করবো না। কিছু কিছু হয়। বাট রেপ্ ? ইমপসিবল্ !

—দ্যাট উওম্যান ওয়াজ রেপ্‌ড অলরাইট। আই ক্যান প্রুভ দ্যাট মেডিক্যালি !

—হতে পারে। ওপারে হয়েছে। হিন্দু মেয়ে, একা একা কেন আসছিল ? রিস্‌ক তো আছেই, লেকিন আমার জওয়ানরা কেউ তাকে টাচ করবে না।

—আপনি এত শিওর হচ্ছেন কী করে ?

রাগ যেন ফেটে পড়ছে ক্যাপটেনের মুখ চোখ দিয়ে। একবার সে কোমরের পিস্তলেও হাত দিল। যেন এত বড় অভিযোগ শুনে সে ডাক্তারকে গুলি করতেও দ্বিধা করবে না।

দরজার কাছে গিয়ে সে হাঁক দিল, জিন্দাল, এ জিন্দাল, ইধার আও ! তুরন্ত !

তারপর সে ডাক্তারের দিকে ফিরে হুংকার দিয়ে বললো, আমার স্টাফের কেউ কোনোদিন কোনো মেয়েছেলেকে টাচ করবে না। কাউর সে সাহস হোবে না। আমি সব করাপশন চেক করতে পারি না। লেকিন, আমি সব স্টাফদের বলে দিয়েছি, মেয়েছেলের ইজ্জৎ যদি কেউ নোষ্টো করে, আমি তার মাথার খোপরি উড়িয়ে দেবো ! তাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো···

হঠাৎ সে থেমে যায়। তার চোখে জল আসে।

এমন তেজস্বী পুরুষটি যেন কিশোর হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার সারা মুখে

www.BanglaBook.org

ছড়িয়ে পড়েছে এক অসহায় বিষাদ। সে ধরা গলায় বললো, ডাক্তারসাব, পাঞ্জাবে আমার বড়া বহিন, আমার নিজের দিদি…

ডাক্তারই এবার চক্ষু নত করলো।

একটু পরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো জিন্দাল। খালি পায়েই সে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকলো, কপালে হাত ছুঁইয়ে স্যালুট করে সে বললো, আপ বোলায়া, ক্যাপটেন ?

তাকে দেখে ডাক্তার আঁৎকে উঠলো প্রায়। পকেট থেকে রুমাল বার করলো। সেই রুমাল দিয়ে সে সাপটে মুখ মুছতে গেল, তার ঠোঁটে যে জলন্ত সিগারেট রয়েছে সে খেয়াল নেই।

দুই ধারে একই মাটি মইধ্যে খড়ির দাগ
মানুষগুলান একই রে ভাই, তবু হইলো ভাগ
আহা মইধ্যে খড়ির দাগ।
পেটের জ্বালা, হাসি-কান্না, একই রক্ত ঘাম
কেউ বলে আল্লা কেউ জপে হরির নাম
আহা একই রক্ত ঘাম
খড়ির দাগের উপরে সেই কইন্যার দেহখানি
দুই দিকে আল্লা-হরি করেন টানাটানি
আহা কইন্যার দেহখানি

সেদিন দুপুরবেলা খাঁকি পোশাক ও পায়ে পট্টি লাগানো জুতো পরা একজন মধ্যবয়সী মানুষ সীমান্তের একধার দিয়ে অলসভাবে হাঁটছিল। মাথার ওপর জ্বলছে সূর্য, আর তার পেটে জমছে খিদে। সে একবার ঘড়ি দেখলো, আর আধ ঘণ্টা পরেই তার টহল দেওয়া শেষ হবে। এই লোকটির শরীরে মেদ জমতে শুরু করেছে, তার যখন তখন খিদে পায়।

এদিকে ধান ক্ষেত নেই, নিছক জলা জমি। এই গ্রীষ্মে জল প্রায় শুকিয়ে সর্বত্র কাদা কাদা হয়ে আছে। লোকটি তাই পা ফেলছে বকের মতন। কাঁটাতারের বেড়া নেই, মাঝে মাঝে পোঁতা রয়েছে সিমেন্টের বাউণ্ডারি স্টোন, তাই দেখে দেখে সীমান্ত বুঝতে হয়।

এখানে সেখানে বেত-বাবলার ঝোপঝাড়, আর এক কিলোমিটার দূরে একটা নদীর খাত। লোকটি সেই নদী পর্যন্ত যাবে ঠিক করেছে। একটা ঘন মতন ঝোপ দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। এখানে জনমনিষ্যি নেই। কেউ তাকে দেখবে না,

www.BanglaBook.org

তবু তো একটা অভ্যেসের ব্যাপার আছে। সে প্রথমে জামার বোতাম খুলে পৈতেটা বার করে কানে জড়ালো, তারপর প্যান্টুলের বোতাম খুলতে গেল।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটা পা। মানুষের পা! মেয়ে মানুষের পা, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত, তার ওপরে শাড়ীর আভাস। বাকি শরীরটা ঝোপের মধ্যে।

লোকটি প্রথমেই কপাল চাপড়ে ভাবলো, হায় রাম, কেউ একটা মুর্দা ফেলে গেছে?

কিন্তু পুরুষের পা তো নয়, মেয়েলি পা, রোমহীন, সুগোল, টাটকা। মৃত মেয়ে মানুষেরও শরীরখানি একবার দেখতে কার না ইচ্ছে হয়?

লোকটি নিচু হয়ে, পা খানা না ছুঁয়ে ঝোপটা দু'হাতে সরিয়ে দেখলো এক প্রায় নগ্ন নারীকে। তার ব্লাউজ ফালা ফালা করে ছেঁড়া, সায়া নেই, একটা শাড়ী তার গায়ের ওপর ছড়ানো। এবং রমণীটির মাথাটা নড়ছে, মুখখানা কুঁকড়ে আছে যন্ত্রণায়। সে যেন অনেকক্ষণ এখানে চেতনাহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। একটু একটু করে তার জ্ঞান ফিরছে। তার শরীরে অনেক নখের আঁচড়।

খাঁকি পোশাক পরা লোকটির মন করুণায় ভরে গেল। আরে ছি ছি ছি, জেনানারা হলো গিয়ে মায়ের জাত, তাদের ওপর কেউ এরকম অত্যাচার করে? সেই নিমকহারামগুলো কি কোনোদিন মায়ের দুধ খায়নি?

ছুটে গিয়ে সে কাছাকাছি একটা ডোবা থেকে আঁচলা করে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলো সেই নারীর মাথায়। বিড় বিড় করে বারবার বলতে লাগলো, ছি ছি ছি ছি।

একটু একটু করে চোখ মেললো সেই রমণী। তারপর চোখের জ্যোতি ফুটতেই সে দেখতে পেল দাড়ি না কামানো একখানা গোল মুখ, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, একটা ভারী শরীর।

প্রাণ ভয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো সেই নারী। সেই ডাকে কোনো সাহায্য পাবার আশায় নয়, ঠিক যেন মৃত্যু-আর্তনাদ।

খাঁকি পোশাক পরা লোকটি বললো, ডরিয়ে মৎ মাইজী, কই ডর নেহি, ম্যায় কুছ নেহি করুংগা।

স্ত্রীলোকটি হ্যাঁচোড় প্যাচোড় করে উঠে বসে শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে চ্যাঁচাতেই থাকে।

লোকটি হাত জোড় করে কাতর ভাবে হিন্দীতে বললো, আর কোনো ডর নেই, আপনি চুপ করুন মা, এখানে কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।

www.BanglaBook.org

মেয়েটি আস্তে আস্তে থামলো। অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো মোটকা সোটকা লোকটির দিকে। প্রথমে সে ভেবেছিল, এই তার আগের আততায়ী, এখন চিনতে পারলো, এ অন্য লোক। ফাঁকা জলাভূমি, কাছাকাছি অন্য কোনো মানুষ নেই, তবু এই অচেনা পুরুষটি তাকে মা বলে সম্বোধন করছে?

এক সময় সে শুকনো গলায় মিনতি করে বললো, জল। আপনে আমারে একটু জল দিবেন? তেষ্টায় মইলাম!

কোনো পাত্র নেই। লোকটি নিজের আঁজলা ভরেই জল নিয়ে এলো। মেয়েটি ঠিক একটা পাখির মতন গলা লম্বা করে সেই জল শুষে খেয়ে নিল একেবারে।

লোকটি একটু দূরে বসলো। সে বুঝেছে, এটি ওপার বাংলার একটি হিন্দু মেয়ে। পানির বদলে জল বলেছে। তামাম হিন্দুস্থানে সবাই পানি বলে, শুধু বাংলা মুলুকেই জল বলে। এখানকার হিন্দু-মুসলমানদের জল আর পানি দিয়ে চেনা যায়।

সে আরও করুণায় বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বহিনজী, তোমার এ দশা কী করে হলো? এই ঝোপের মধ্যে কে তোমাকে ফেলে রেখে গেল?

মাইজী বলার মতন বয়েস নয়, তাই লোকটি এবার বহিনজী সম্বোধন করলো।

মেয়েটি কাল রাতের পর আর কিছু মনে করতে পারে না। তখন সে এখানে ছিল না। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

টুকরো টুকরো ভাবে কথাগুলো শুনতে শুনতে লোকটি জিভ দিয়ে আফসোস করে। একটি হিন্দু নারীর অবমাননায় তার রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে। আরে ছি ছি ছি ছি, ঐ হারামজাদাগুলো কি মানুষ? ওদের নরকের ভয়ও নেই?

মেয়েটির বাঁ গালে একটা ছড়ে যাবার লম্বা দাগ, গলায় কালসিটে, বাঁ দিকের স্তনের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে আছে। তার ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা।

সে মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে বললো, আহা, তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছে ঐ হারামীরা। তুমি একেলা কেন এলে? তোমার সঙ্গে কেউ ছিল না, বহিন?

মেয়েটি লোকটির হাত ধরলো। তার হাত থরথর করে কাঁপছে, সেই হাত সান্ত্বনা চায়। সামান্য মমতার কথা শুনেই তার চোখে জল এসে যাচ্ছে।

লোকটির দৃষ্টি মেয়েটির বুকে আটকে গেল। সেই দৃষ্টি যেন আঠার মত, কিছুতেই চোখ সরতে চায় না, দিনের পর দিন সে কোনো স্ত্রীলোক দেখতে পায়

www.BanglaBook.org

না। স্মাগলাররা কিংবা অন্য যারা এখান দিয়ে বেআইনীভাবে পারাপার করে, তাদের মধ্যে মেয়ে থাকে কদাচিৎ। নারী বর্জিত জীবন এমনই শুকনো, খরখরে যে সে এবং তার অন্য সহকর্মীরা মাঝে মাঝে পালা করে অল্প বয়েসী রান্নার ছেলেটিকে জড়িয়ে শোয়।

এখন তার চোখের সামনে শুধু একটি নারী নয়, তার স্তন, কোমর,, উরুতে ভোগের চিহ্ন। একটু আগে এই মেয়েটির দুঃখের কথা শুনে তার রক্ত গরম হয়েছিল, এখন সেই রক্ত আরও গরম হতে থাকে।

প্রথম এই ঝোপের সামনে থামবার পর সে বিশেষ কারণে প্যান্টুলের বোতাম খুলছিল, এখনো তা খোলাই আছে। কানে জড়ানো আছে পৈতে।

মেয়েটির বুকে হাত রাখলো সেই জওয়ান।

না, না, তার কোনো খারাপ মতলোব নেই। এই অবলা হিন্দু নারীর ওপর ওপারের বদমাসগুলো অত্যাচার করেছে,আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে পর্যন্ত, সে শুধু সেই সব ক্ষতে হাত বুলিয়ে মেয়েটিকে একটু শান্তি দিতে চায়।

বুকের ওপর পুরুষের থাবা পড়তেই মেয়েটি কেঁপে উঠলো। সে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তার একটা হাত ধরে টেনে নরম গলায় বললো, ঘাবড়াও মৎ, ঘাবড়াও মৎ! আমি সেইরকম লোকই নয়। তোমাকে শুধু একটু আদর করে দিচ্ছি, তুমি আরাম পাবে। তুমি শুয়ে পড়ো। আমি শুধু আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেবে!

মেয়েটি সরু গলায় বললো, ওগো, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাবো!

লোকটি তাকে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বললো, যাবে, যাবে, বাড়ি তো যাবেই। কিন্তু এখন কি বাড়ি যাবার মতন তাগৎ তোমার আছে? একটু শুয়ে বিশ্রাম করে নাও, আমি তো আছি, ভয় কী? একদম ভয় পাসনি, পাগলী?

মেয়েরা পুরুষের স্পর্শের ভাষা বোঝে। তার সর্বাঙ্গে ব্যথা, একজন পুরুষের স্পর্শে তার এখন আরাম পাবার প্রশ্নই ওঠে না, তার শরীর ঘুলিয়ে উঠছে। বমি পাচ্ছে। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কেঁদে উঠলো।

লোকটি এদিক ওদিক তাকালো। দেখবার কেউ নেই। কেউ কিছু জানবে না। আজকের দিনটা কেটে গেলে কেউ আর তার ধরা ছোঁওয়াও পাবে না। তাহলে আর দেরি কেন? এই বোকা মেয়েটা শুধু শুধু আপত্তি করছে। আরে, আগে তো তোর ধরম নাশ হয়েই গেছে, এরপর আর সতীপনা দেখিয়ে লাভ

www.BanglaBook.org

কী ? তুইও একটু সুখ করে নে, আমিও একটু সুখ করে নিই। তারপর তুই বাড়ি যা !

লোকটির নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। সে জোর করে শুইয়ে দিতে গেল মেয়েটিকে। এখন সে খিদে ভুলে গেছে, এখন তার দ্বিগুণ খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি ছটফট করতে করতে বললো, আল্লার দোহাই, আমারে ছেড়ে দাও ! ওগো, আমি আর সহ্য করতে পারবো না। আমি মরে যাবো। তোমার পায়ে পড়ি, দয়া করো, আল্লা তোমার ভালো করবেন ! ছেড়ে দাও !

লোকটি এবার খপ করে চেপে ধরলো মেয়েটির মুখ। শরীরে তার অসুরের মতন শক্তি এসে গেল ! এবার সে বিবেকেরও সায় পেয়েছে।

সে হিসহিস করে বললো, শালী, মুসলমানের বাচ্চী ! এতক্ষণ আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছিলি ? ওপারের লোকরা হিন্দু মেয়ে পেলেই ফোঁকট্‌সে মজা লুটে নেয়, কত হিন্দু মেয়ের ওরা সর্বনাশ করেছে। পাকিস্তানী যুদ্ধের সময় আমি দেখিনি ! আজ পেয়েছি একটা মুসলমানের লেড়কী, আজ আমি শোধ তুলবো।

দুর্বল মেয়েটি তবু বাঁচার চেষ্টায় নিজেকে যত ছাড়াবার চেষ্টা করে, লোকটি ঠাস ঠাস করে তার গালে তত চড় মারে। মারতে মারতে সে মেয়েটিকে প্রায় অবশ করে দিল। তারপর তার শাড়ীটা সরিয়ে দিল। বাঘের মতন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে কামড়ে ধরলো মেয়েটির একটা বুক। ঠিক বাঘের মতনই শব্দ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে, যেন সে সত্যিই কাঁচা মাংস খাচ্ছে।

একটু পরে সব শেষ হয়ে যাবার পর সে ঝোপে হেলান দিয়ে বসলো। এখনো তার সারা গা দিয়ে গল্‌গল করে ঘাম বেরোচ্ছে, যেন সমস্ত রোমকূপের কল খুলে গেছে।

এই অবস্থাতেও সে প্যান্টের পকেট থেকে বার করলো দামি সিগারেটের প্যাকেট। সে প্যাকেটটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। বিলিতি লাইটার দিয়ে সে একটা সিগারেট ধরালো।

শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় এসে জেঁকে বসলো তার শরীরে। এরপর কী হবে ? কেউ দেখে নি, কেউ জানতে পারে নি, সে সব ঠিক আছে। এখন সরে পড়লেই হয়। কিন্তু মেয়েটি কি এখানেই পড়ে থাকবে ? এরপর এখানে এসে যে এই মেয়েটিকে দেখবে, সে যদি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয় ? মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে সব কথা যদি বলে দেয় ? দিনের আলোয় মেয়েটা তার

www.BanglaBook.org

মুখ চিনে রেখেছে নিশ্চয়ই। মুসলমানের মেয়ে ছিটকে চলে এসেছে এদিকে। ওপারে ফিরে গিয়ে যদি হল্লা করে ?

এই সব কাজে কোনো চিহ্ন রাখতে নেই।

ঠিক, মেয়েটার যা অবস্থা, তাতে ওর আর জ্ঞান ফিরতে দেবার দরকারটাই বা কী ? একেবারে শেষ করে দিলেই তো হয়। তারপর টানতে টানতে নিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া যায়। কিংবা বাংলাদেশের বর্ডারের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে দিলেই হলো। ওরা এদিকে বিশেষ আসে না, অন্তত দু'তিন দিন কারুর চোখেই পড়বে না !

ধীরে সুস্থে সে সিগারেটটা শেষ করলো, তাতেও ঠিক মৌজ হলো না। আর একটা সিগারেট ধরালো। হঠাৎ সে অনুভব করলো, তার শরীরে একটা কাঁপুনি লেগেছে, তার শীত করছে। এ আবার কি ব্যাপার ? একবার ট্রেনিং-এ তাকে লাদাখ পাঠানো হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গার মতন শীত। ওরে বাপরে, এত রোদ্দুরে এত শীত ! এখন যত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালানো যায় ততই মঙ্গল।

সে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটির গলা টিপে ধরলো !

একটা আধমড়া মেয়ে মানুষ, তার দম নিকলে দিতে কতটুকুই বা সময় লাগবে ! দু'তিনবার চাপ দিলেই ব্যাস।

কিন্তু, কথায় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তুমি যাও বঙ্গে, কপাল তোমার সঙ্গে !

খাঁকি পোশাক পরা লোকটি নিরিবিলিতে মাঠের মধ্যে, ঝোপের আড়ালে বসে যে শান্তিতে একটা মেয়েকে খুন করবে, তারও উপায় নেই ! সব জায়গায় ঝামেলা ! এখানেও মূর্তিমান উপদ্রবের মতন হাজির হলো অন্য একজন।

গলায় চাপ পড়ায় মেয়েটির আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, তারপর কণ্ঠনালী রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সে আর শ্বাস নিতে পারছে না, চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, জ্ঞান হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে দেখলো দ্বিতীয় একজন অদ্ভুত, বিকট চেহারার, পুরুষকে। সে কী যেন দুর্বোধ্য এক হাঁক দিল, তারপর লাফিয়ে উঠলো শূন্যে।

॥ ৫ ॥

ক্যাপ্টেন বললো, আও জিন্দাল, ভিতর আকে বায়ঠো !

www.BanglaBook.org

ডাক্তার বললো, এই তো সেই লোক, একেই সব জিজ্ঞেস করুন !

ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে এখনও স্মৃতি মাখা বিষাদ মুছে যায় নি। ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বললো, আপনি কী করে আইডেন্টিফাই করবেন ডাক্তার সাব ! আপনি সেখানে প্রেজেন্ট ছিলেন না। আপনি চুপচাপ বসুন। আমি আমার স্টাফকে জেরা করে সব কিলিয়ার করে নিচ্ছি। বয়ঠো জিন্দাল, সিগারেট পিয়োগে তো পিও !

জিন্দাল গায়ে একটা জামা চড়িয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে সিগারেট টানার অনুমতি পাওয়া একটা দুর্লভ সম্মান। সে আর দেরি করলো না, সঙ্গে সঙ্গে ধরালো একটা।

ক্যাপ্টেন পরমজিত সিং খাটের তলা থেকে একটা সুটকেস টেনে তার থেকে তুলে নিল তিনটে বিদেশী চকোলেট বার। দুটো সে ডাক্তার ও জিন্দালের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে একটা ভেঙে মুখে পুরলো। তারপর ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলো, হাঁ, ডাক্তারসাব, সেই ডেটটা কী ছিল ? কোন্ দিন ?

ডাক্তার বললো, পরশুর আগের দিন। হ্যাঁ, তিনদিন আগে। এই তিনদিন তাঁকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি গেছে।

ক্যাপ্টেন বললো, দ্যাট মিন্‌স, আমাকে সাঁপে বাইট করার দু'রোজ পরে ? ঠিক কি না ? সেদিন সারা দুপুর আমি ঘুমোচ্ছিলাম। আগের চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাইনি প্র্যাকটিক্যালি, সেই জন্য। হাঁ, জিন্দাল, অভি তুম বাতাও, সাত্তাইশ তারিখ ডে-ডিউটি কার কার ছিল ?

জিন্দাল বললো, মুঝে তো মালুম নেই ক্যাপ্টেনসাব ! ম্যায় তো উসদিন খানা পাকায়া।

হঠাৎ বজ্র পতনের মতন গর্জন করে থিয়েটারি চালে পরমজিত বললো, ঝুট মাৎ বলো ! একটা মিথ্যে কথা বললে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো !

জিন্দাল একটুও বাংলা জানে না, সে দুর্বোধ্য ধরনের হিন্দী বলে। সে ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে খুব একটা বিচলিত না হয়ে শান্ত গলায় বললো, ক্যাপ্টেনসাব, আপনার ইয়াদ হচ্ছে না ? আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, রান্না শেষ করার পর আমি আপনাকে ডেকে তুললাম। বেগুনের ভর্তা আর মুর্গা রোস্ট হয়েছিল সেদিন, আপনি খেয়ে আমার দুটো রান্নারই অনেক তারিফ করলেন।

ক্যাপ্টেন খানিকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঠিকই তো ! এক-দুই, তিন হ্যাঁ, পরশুর আগের দিন ঐ সব রান্নাই হয়েছিল এবং জিন্দাল তাকে ডেকে

www.BanglaBook.org

খাইয়েছিল। রান্নাঘরে যদি ডিউটি থাকে, তা হলে জিন্দাল অতদূরে গিয়ে একটা মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন করে আসবে কী করে ?

অন্যদের বাদ দিয়ে জিন্দালকেই সে ডেকেছে, কোনো সন্দেহের কারণে নয়। হাবিলদার জিন্দালের পদ মর্যাদা তার পরেই। এর আগেও জিন্দাল তার সঙ্গে মেঘালয়ে ছিল। জিন্দালের সঙ্গে তার অনেকদিনের বন্ধুত্ব, তাই ঠাট্টার ছলে সে জিন্দালকে জুতো মারবো, জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো, এই সব বলে। নইলে, সার্ভিসে আজকাল সহকর্মীদের এরকম ভাবে ধমকানো যায় না।

জিন্দাল জানে, এই এলাকার মধ্যে কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে তা কিছুতেই ক্ষমা করবে না পরমজিৎ সিং। এ বিষয়ে তার বিশেষ বেদনা আছে। তাছাড়া, পরমজিৎ কোনোদিন হিন্দু-মুসলমানের তফাৎ করে না।

পরমজিৎ বললো, জিন্দাল, এই ডাক্তার সাহেব মানী লোক। তুমি তো জানো, উনি কত যত্ন করে আমাকে সাঁপের বিষ থেকে বাঁচিয়েছেন। নিজে গরজ করে আমাকে দেখতে আসেন। ডাক্তারসাব বলছেন, এই এরিয়ার মধ্যে এক জেনানা রেপ্‌ড হয়েছে। সেই জেনানা ডাক্তারসাবের হেফাজতে আছে। উনি সাসপেক্‌ট করছেন কী, আমারই কোনো লোক এই কাম করেছে।

ডাক্তার বললো; সাসপেক্‌ট নয়, এটাই ফ্যাক্‌ট !

জিন্দাল বললো, কভি নেহি হো শকতা ! ক্যাপ্টেন পরমজিতের কোনো স্টাফ এমন পাপ কাজ কিছুতেই করবে না। অন্য কেউ করে এখানে ফেলে রেখে গেছে। সেরকম হতে পারে।

ডাক্তার বললো, কাপ্টেন সাহেব, আমি অনেকক্ষণ বসে আছি, এবার উঠবো। আমি কিন্তু ছাড়বো না, থানায় ডায়েরি করবো। পুরো ঘটনার এনকোয়ারি হবে। খবরের কাগজকে জানাবো। আমি আপনার কাছে এসেছিলুম এই জন্য যে, আপনাকে আমার একজন খাঁটি মানুষ মনে হয়েছিল, ভেবেছিলুম, আপনি নিজেই একটা কিছু ব্যবস্থা নেবেন।

ক্যাপটেন বললো, ব্যবস্থা আমি ঠিকই নেবো। আপনার চোখের সামনেই। আর একটু বসুন। আপনি মেয়েটির কথা একবার বললেন হিন্দু, আবার বললেন মুসলমান। তার ঠিক পরিচয় জেনেছেন ? মুসলমান হলে বাংলাদেশ সাইড থেকেও প্রটেস্ট আসবে। গভর্নমেন্ট লেভেলে চলে যাবে।

ডাক্তার বললেন, মেয়েটি হিন্দু। তার নাম বীণা, তার বাবার নাম মণীন্দ্র সাহা। তার আক্রমণকারীর মুখে হিন্দী শুনে সে তাকে মুসলমান বলে ভুল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিল, তাই আল্লার নাম করে সে তার কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলো পরমজিৎ। তার মনটা যেন পাঞ্জাবের কোনো গ্রামে ফিরে গেছে। সে দেখছে অন্য দৃশ্য।

তারপর সে বললো, খানার টাইম হয়ে গেছে, এখন সবাই চেক পোস্টে ফিরে আসবে। আমি একে একে প্রত্যেককে আপনার সামনে আনছি। আমি প্রত্যেককে জেরা করবো, আমার সামনে কেউ ঝুট বোলে না। আমি ঠিক ধরতে পারি।

ডাক্তার সামান্য একটু বক্রভাবে হাসলো। মানুষ হাজার রকম ভাবে মিথ্যে বলতে পারে। অধিকাংশ মানুষই অতি দক্ষ অভিনেতা। মিথ্যে কথা ধরা অত সহজ নয়।

ক্যাপ্টেন গম্ভীর ভাবে বললো, পহলে জিন্দাল, তুমি তোমার মা-বহিনের নামে ওথ্ নিয়ে বলো—

জিন্দাল সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পরমজিতের একটা হাঁটু ছুঁয়ে বললো, আমি মা বহিনের নামে কশম খেয়ে বলছি, আমি জিন্দেগিতে কোনো স্ত্রীলোকের—হিন্দু কিংবা মুসলমানের—ধরমনাশ করি নি। আমার ঘরে জরু-বালবাচ্চা আছে, আমার বিছানার পাশে তাদের ছবি রাখা আছে, আমি অন্য কোনো স্ত্রীলোককে পাপ চোখে দেখি না। ক্যাপটেন সাব, আপনি আমাকে চেনেন।

বলতে বলতে জিন্দালের মতন এক গাঁট্টা গোঁট্টা জোয়ানের চোখে জল এসে গেল, গলা ধরে এলো।

কাপ্টেন তাকালো ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারের মন একটুও গলেনি। সে দৃঢ় গলায় বললো, এই লোকটাই কালপ্রিট!

জিন্দাল এমন জোরে একটা নিঃশ্বাস টানলো যেন এই মুহূর্তে সে ডাক্তারের মুণ্ডুটা গুঁড়ো করে ফেলবে। পরমজিতও চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ডাক্তার সাব, যে জওয়ান এক বাপের ব্যাটা, সে কখনো কশম খেয়ে ঝুট বলে না!

ডাক্তারদের প্রায়ই মৃত্যুর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হয়, তাই বোধহয় তাদের ভয় ডর থাকে কম। জিন্দালের হিংস্র ও অদ্ভুত মুখ-মণ্ডলের দিকে সে চেয়ে রইলো তীব্র ভাবে।

তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বসলো, অত্যাচারে, সেই মেয়েটির মাথার

www.BanglaBook.org

ঠিক নেই। সে অসংলগ্ন কথা বলে। অসংলগ্ন মানে কী জানেন তো, ইনকোহেরেন্ট, টুকরো টুকরো দৃশ্য তার মনে পড়ে যায়, দু'দিন ধরে আমি একটু একটু করে শুনেছি। এই অবস্থায় তার বানিয়ে বলার কোনো ক্ষমতা নেই, যখন যেমন মনে পড়ছে, সে তাই বলছে। তার একটা কথার মানে আমি আগে বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। সে বলেছিল, খাকি পোশাক পরা লোকটি যখন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলছিল, সেই সময় দ্বিতীয় একজন সেখানে এসে পড়ে। এবং সে শূন্যে লাফ দিয়েছিল। সে মানুষ হলেও মানুষের মতন দেখতে নয়, ঠিক যেন দৈত্য !

ক্যাপ্টেনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এবার সেও যেন কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

ডাক্তার বললো, আপনার কাছে আসবার আগে আমি ক্লিয়ার করে নিতে চেয়েছি যে আপনিই আসামী কিনা ! আপনি নিজে আসামী হলে তো আপনার কাছে বিচার চেয়ে কোনো লাভ নেই ! সেই জন্য আমি বীণাকে বার-বার জিজ্ঞেস করেছি, সেই লোকটার মুখে কি দাড়ি ছিল ? মাথায় পাগড়ি ছিল ? সে কি সর্দারজী ? মেয়েটি বারবার মাথা নেড়েছে। ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং ইউ আর ক্লিয়ার। মেয়েটি এক সময় বললো, সেই দু'জনের একজনকে দৈত্যের মতন দেখতে, তার মুখে দাড়ি গোঁফ নেই, তার চোখের পাতা নেই, ভুরু নেই, এমনকি মাথায় একটাও চুল নেই। তার নাকের রং কালো।

ডাক্তার ঘুরে গিয়ে জিন্দালের দিকে আঙুল তুলে বললো, অবিকল এই লোকটির ডেসক্রিপশান !

জিন্দাল ডাক্তারের বাংলা কথা বুঝতে পারে নি, কিন্তু ডাক্তার তার মাথার দিকে ইঙ্গিত করতেই তার মুখ শুকিয়ে গেল, সে চোখ নীচু করলো।

দেরাদুনে টেনিং-এর সময় একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া প্র্যাকটিশ হচ্ছিল সেদিন। জিন্দালের পাশের জওয়ানটি একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড তুলতেই সেটা এক্সপ্লোড করলো তার হাতে। সেই লোকটির হাতখানা উড়ে গেল তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক এসে লাগলো জিন্দালের মাথায়, তার চুল জ্বলতে লাগলো। সেই অবস্থায় শুধু চোখ দুটো চাপা দিয়ে জিন্দাল ছুটেছিল।

চোখ দুটো বাঁচাতে পেরেছিল বলেই জিন্দালের চাকরি রক্ষা পেয়েছে। তার মাথায় আর চুল গজায় না। পল্লব আর ভুরুও নেই। তার মুখের রং ফর্সা, কিন্তু

www.BanglaBook.org

নাকটা কালো হয়ে আছে।

মেয়েটির এই বর্ণনা আর দ্বিতীয় কোনো মানুষের সঙ্গে মিলবে না।

কম্পিত গলায় জিন্দাল বললো, ভগওয়ান সাক্ষী, আমি মা-বহিনের নামে কশম খেয়ে ঝুট বলিনি। আসলে যা ঘটেছিল, আমি খুলে বলছি!

সেদিন জিন্দালের রান্নার ডিউটি ছিল ঠিকই। কিন্তু রান্না শেষ হতে না হতেই ক্ষুধার্ত জওয়ানরা এসে রান্নাঘরে ভিড় জমালো, রান্নাঘরে জিন্দাল নিজেই মাটি দিয়ে একটা তন্দুর বানিয়েছে, চিকেন তন্দুরি বানাতে সেই একমাত্র জানে। রান্নার সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, অন্য জওয়ানরা সবাই পাত পেতে বসে গেল। পৌনে একটার মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ।

কাপ্টেন সাহেব ঘুমোচ্ছেন। দু তিনদিন আগে কাপ্টেনকে সাপে কামড়েছিল, সাপে কামড়ালে ঘুমোনো নিষেধ, তাই তাকে জাগিয়ে রাখা হয়েছিল প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা। পরদিন বিকালে ডাক্তার এসে দেখে বলে গিয়েছিল আর কোনো ভয় নেই, তবু দ্বিতীয় রাতেও তার ঘুম আসেনি। তাই এখন তাকে ঘুমোতে দেওয়া হয়েছে। দুটো-আড়াইটের সময় তাকে জাগিয়ে খাবার দিলেই চলবে।

জিন্দালের খেয়াল হলো, দেড়টা বেজে গেছে, তবু একজন জওয়ান এখনো খেতে আসে নি। মহাবীর লাল? এই মহাবীরের বেশি বেশি খিদে, ডিউটিতেও সে ফাঁকি মারে, সে কেন এখনো খেতে এলো না। তা হলে কি তার কোনো বিপদ হলো? তাকেও সাপে কামড়েছে?

ভুরি ভোজ খেয়ে অন্য জওয়ানরা শুয়ে পড়েছে, কেউ মহাবীরকে খুঁজতে যাবে না। ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে আছে বলে দুপুরের বদলির ডিউটিতে যাদের যাবার কথা, তারাও গড়িমসি করে সময় কাটাচ্ছে। দিনের বেলার ডিউটিতে কোনো মধু নেই, শুধু শুধু খাটুনিই সার। দিনের বেলা টহল না দিলেই বা ক্ষতি কী?

জিন্দালেরও ভারি খুঁজতে যাবার দায় পড়েছে। কিন্তু মহাবীর লাল তার একগ্রামের লোক। শুধু তাই নয়, মহাবীরের ছোট ভাই বিয়ে করেছে জিন্দালের চাচার মেয়েকে। সুতরাং প্রায় আত্মীয় বলা যায়, সেই লোকটা সাপের কামড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কোথাও পড়ে রইলো কিনা, সেটা একটু দেখা দরকার না? খাওয়ার সময় দেরি করা যে মহাবীর লালের স্বভাবের সঙ্গে একটুও মানায় না, সে এতক্ষণ অনুপস্থিত।

একটা লাঠি নিয়ে জিন্দাল বেরিয়ে পড়লো।

খুঁজতে খুঁজতে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারতেই সে দেখলো

www.BanglaBook.org

এক অভাবনীয় দৃশ্য। মহাবীর এক জেনানার গলা টিপে খুন করছে। এ ভূমিকাতেও মহাবীরের মতন মানুষকে কল্পনা করা যায় না। লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?

দেরি করার সময় নেই, জিন্দাল এক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো মহাবীরের ঘাড়ে। এক ধাক্কায় তাকে ছিটকে ফেলে দিল । কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। মারা গেছে মেয়েটা। তার শ্বাস নেই, তার বুকের ধুকপুক নেই।

মহাবীর হাউ হাউ করে কেঁদে জিন্দালের পা জড়িয়ে ধরে বললো, কাপ্টেন সাবকে বলিস না ! সে বদরাগী লোকটা গুলি মেরে আমাকে খতম করে দেবে। কাল থেকে আমার ছুট্টি, দেশে ফিরে যাবো, ঘরে বাল-বাচ্চা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, জিন্দাল, তুই আমায় বাঁচিয়ে দে !

মহাবীরকে বাঁচাবার তখন একমাত্র উপায় মেয়েটার লাশ বাংলাদেশে পাচার করা। শাড়ী দিয়ে ভালো করে মুড়ে দু'জনে ধরাধরি করে সেই জেনানার মুর্দা ওরা ফেলে এলো বাংলাদেশ বর্ডার পোস্টের অনেকটা ভেতরে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে মহাবীর জলদি স্নান করে নিল। এত খাওয়ার লোভ মানুষটার, তবু অত ভালো স্বাদের মুর্গীর মাংসও সে খেতে পারলো না। শীতে থরথর করে কাঁপছে।

পরদিন থেকে তার ছুটি গ্র্যান্ট হয়ে আছে। আজ তার দিনের বেলা ডিউটি শেষ। আজ বিকেল-রাত্তিরই বা শুধু শুধু এখানে কাটাবার কী মানে হয় ? আজই তো সে বেরিয়ে পড়তে পারে। জিন্দালের পরামর্শে সে বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিল। ক্যাপ্টেন সাহেবের ঘুম ভাঙাবার পর সে তাকে একটা সেলাম ঠুকেই বেরিয়ে পড়লো স্টেশনের দিকে। একবার ট্রেনে উঠতে পারলে তাকে আর পায় কে ? এরপর সে যে-কোনো উপায়েই হোক অন্য জায়গায় ট্রান্সফার নিয়ে নেবে। এখানে আর ফিরবেই না। এই পোড়া বাংলা মুল্লুকে আর মানুষ আসে।

এই ক'দিনে মহাবীর হিল্লি-দিল্লি পার হয়ে গেছে। কত পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল, নদী আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সে পৌঁছে গেছে নিজের বাড়িতে।

ঘরে আছে পুত্র কন্যা অন্ধ বুড়ি মা
ধর্মপত্নী যত্নের সাথে ধুইয়া দিল পা
আহা অন্ধ বুড়ি মা
বাড়িতে আজ কী আনন্দ কত হুড়াহুড়ি

www.BanglaBook.org

ছেলে ওঠে বাপের কান্দে, মেয়ে দেয় সুড়সুড়ি
আহা কত হুড়াহুড়ি
পাড়াপড়শী খবর নিতে ডাকে পরস্পরে
গোয়ালের দুধেল গাই-ও হাম্বা হাম্বা করে
আহা ডাকে পরস্পরে
এত কাণ্ড যারে লয়ে সে-ই বাক্য হারা
অন্ধ মায়ের কথা শুনেও দেয় না কোনো সাড়া
আহা সে-ই বাক্য হারা
দেখে না, শোনে না কিছু, নাই তার কোনো হুঁশ
মহাবীর নামেতে সেই এক বিষম কাপুরুষ
আহা নাই তার কোনো হুঁশ
অঙ্গ কাঁপে থরোথরো দারুণ বিষম শীতে
দণ্ডধারী যমরাজ যেন আসেন তারে নিতে
আহা দারুণ বিষম শীতে
দড়াম করে ভুঁয়ে পড়ে গড়াগড়ি যায়
নিদাঘের দুপুরে মরে শীতের জ্বালায়
আহা গড়াগড়ি খায়...

জিন্দাল বললো, ক্যাপ্টেনসাব, সেই লেড়কী যদি জিন্দা থাকতো, আমি জরুর তাকে তুলে, আর মহাবীরের ঘাড় ধরে এনে আপনার পায়ের কাছে জমা করে দিতাম। কিন্তু আমি আপনা আঁখসে দেখেছি, সে জেনানার শ্বাস ছিল না। মৃত মানুষ তো আর বিচার চায় না। সে যখন মরেই গেছে তখন আর শুধু শুধু আর একজনকে শাস্তি দিয়ে কী হবে ? তা ছাড়া জিন্দাল যেভাবে কাঁপছিল, তাতেই বুঝেছিলাম, ও ব্যাটাকে ভগবান যথেষ্ট শাস্তি দেবেন।

ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বক্রভাবে বললেন, আজকাল আর ভগবানের শাস্তির ওপর বিশেষ ভরসা রাখা যায় না। ক্যাপটেন সিং, আপনি কি তাহলে কিছু অ্যাকশন নিচ্ছেন ?

পরমজিৎ কিছু বলার আগেই জিন্দাল ঘোর অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, ডাক্তারসাব, সে মেয়েটা বেঁচে থাকতে পারে না।

ডাক্তার তার দিকে না তাকিয়ে দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করে বললো, একজন ডাক্তার নিজের সময় নষ্ট করে এতদূরে মিথ্যে বলতে আসে না।

www.BanglaBook.org

জিন্দাল বললো, আপনি তবে দুসরা কোনো মেয়ের কথা বলছেন।

ডাক্তার বললো, আমি যার কথা বলছি, সে তোমাকে দেখেছে।

একটু থেমে সে আবার বললো, তোমরা তাকে মড়া ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। তবু সে বেঁচে উঠেছে। সে বেঁচে উঠেছে তোমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য।

পরমজিতের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

হঠাৎ সে জিন্দালের পশ্চাৎদেশে একটা লাথি কষিয়ে বললো, গাদ্ধে কা বাচ্চে ! তুই সেদিনই আমাকে এই সব কথা বলিসনি কেন ? অত্যাচারের চোটে একটি মেয়ে মরে গেলে আসামীর বিচার করার কোনো দরকার নেই, মেয়েটা আধমড়া হয়ে থাকলে আসামী শাস্তি পাবে, এই তোর বুদ্ধি ? সেদিন জানালে মহাবীরকে ছুটিতে যেতেই দিতাম না। অ্যারেস্ট করে রাখতাম !

ডাক্তার বললো, এখনই আপনার পায়ে এত স্ট্রেইন করাবেন না। আপনি ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করুন। আমিও থানায় ডায়েরি করিয়ে রাখছি। চলি !

পরমজিৎ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে, গট গট করে হেঁটে চলে গেল ডাক্তার। পরমজিতের মুখখানা ছাই রঙা কাগজের মত হয়ে গেছে অপমানে, ঐ বাঙালী ডাক্তারটা যেন তার গালে একটা থাপ্পড় মেরে গেল। পরমজিৎ জোর দিয়ে বলেছিল, তার স্টাফেদের মধ্যে এইরকম অপকর্ম কেউ করতেই পারে না। এই নিয়ে তার গর্ব ছিল। অথচ মহাবীর, সবচেয়ে হাঁদারাম, সবচেয়ে সাধারণ, সারাবছর ধরেই যে বউ ছেলেমেয়ের জন্য নিয়ে যাবে বলে নানারকম জিনিসপত্র জমায়, সে করেছে এমন কাণ্ড ! আর জিন্দাল, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকর্মী, সাহসী এবং নিষ্ঠুর, সেই জিন্দাল সব কিছু জেনেশুনেও মহাবীরকে চলে যেতে দিল ! তাহলে আর মানুষকে বিশ্বাস কী ?

তার চোখে ভেসে উঠছে একটা দৃশ্য। গম ক্ষেতের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে তার বড় বহিন, রাত্রির শিশির জমে আছে তার চুলে ও কপালে।

পরমজিৎ সজোরে মাটিতে বুটের আঘাত করলো। তার ইচ্ছে হলো পুরো চেকপোস্টটাই জ্বালিয়ে দিতে !

গেট পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখলো সাইকেল রিক্শা চালকটি ভ্যানের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার তালের খোসার মতন পিঠ।

www.BanglaBook.org

ডাক্তার বললো, ওঠো বাবাজী ! তুমি ঠিকই ধরেছিলে, তুমি যে লোকটাকে সেদিন স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলে, সে-ই আসল আসামী !

বাঁ হাত দিয়ে কপালে চাপড় মেরে বাবাজী বললো, হা ভগবান ! আমিও তাইলে পাপের ভাগী হলাম !

॥ ৬ ॥

উঠোনোর ডান পাশে একটা জামরুল গাছ আর ফাঁকা গোয়াল ঘরটার পেছনেই বেশ বড় একটা ঝাঁকড়া আম গাছ। এই দুটো গাছের জন্য উঠোনে বেশ ছায়া হয়।

গোয়াল ঘরে গোরু নেই অনেকদিন, এখন তার মধ্যে একটা বড় উনুন। শীতকালে জ্যামনি ওখানে খেজুর রস জাল দিয়ে গুড় বানায়। তার হাতের পাটালি গুড়ের দর পাওয়া যায় ভালো। এখন সেখানে জ্যামনি কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে খড় মিশিয়ে গুল দিচ্ছে। এই গুল বিক্রি হয় বাজারে। ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি আসছে বলে বাইরে শুকোতে দেবার উপায় নেই।

জামরুল গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে আছে সেই মেয়েটি, যার নাম বীণা। এখন তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে মাত্র কয়েকদিন আগেই সে এই উঠোনে ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, বৃষ্টিতে ভিজেছে, মার খেয়েছে। জ্যামনির দেওয়া একখানা লাল পাড় শাড়ী পরে আছে সে, চোখ-মুখ পরিষ্কার, চুলে তেল দিয়ে সে পুকুরে স্নান করে এসেছে সাত সকালে। শুধু তার ডান পায়ের পাতায় দুটো বড় বড় ফোস্কা, ওখানে গোষ্ঠবিহারী ন্যাকড়া পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিল।

বীণা সহজে কথা বলতে চায় না। এক এক সময় যে-যতই প্রশ্ন করুক সে কোনো উত্তরও দেবে না, মুখও তুলবে না। প্রথম রাত্রে ডাক্তারের সামনে বিকারের ঘোরে সে কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা বলেছিল, তারপর থেকে সে যত সুস্থ হচ্ছে, ততই চুপ করে যাচ্ছে। তার পূর্ব পরিচয় প্রায় কিছুই এখনো জানা যায়নি।

দূরে বড় ঘরটার দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে শ্যামা, ইজের পরা, খালি গা। বিষ্টু আর শিবু ইস্কুলে গেছে, শ্যামা বাড়িতেই পড়াশুনো শিখছে একটু একটু। বিষ্টু তাকে অজ-আম-ইট পড়তে শিখিয়েছে। ঝকঝকে দুধ-রঙা দাঁত দিয়ে একটা কাঁচা আম চিবোচ্ছে শ্যামা।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ বীণা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, এই, এই !

ঠোঁটের ওপর কাঁচা আমটা থামিয়ে রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শ্যামা। মাত্র সাত বছর বয়েস হলেও সে বুঝতে পারে যে তাদের বাড়িতে এই অচেনা স্ত্রীলোকটি আসার পরে অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। এই মেয়েটা কি তাদের বাড়িতেই থাকবে নাকি ? চলে যাবে না ? ওর বাড়ি নেই ?

বীণা আবার ডাকলো, এই শোন্ ! ইদিকে আয় !

শ্যামা ভয় পেল না, পাশ থেকে আর একটা কাঁচা আম তুলে নিয়ে গুড়গুড়িয়ে হেঁটে গেল মেয়েটির কাছে। একটা আম বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

বীণা সেই আমটি নিয়ে নুন ছাড়াই কচকচিয়ে খেতে খেতে বললো, তুই এক্কা দোক্কা খ্যালবি আমার সাথে ?

শ্যামা বললো, হেঁ, আমি খেলতে জানি !

গুল দেওয়া থামিয়ে জ্যামনি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলো বাইরে। পাগল মেয়েটা শ্যামাকে ডাকে কেন ? পাগলদের কিছু বিশ্বাস নেই। গড়াইদের বাড়ির এক বউ পাগল হয়ে গিয়ে তার ছোট ননদের গলা টিপে ধরেছিল।

বীণা একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ির চাড়া এনে উঠোনে এক্কাদোক্কার কোর্ট কাটলো। তারপর বললো, তুই আগে, না আমি আগে ?

শ্যামা বললো, আমি আগে। এটা আমাদের বাড়ি।

বীণা বললো, ইস ! দান দে; যে আগে শেষ কোটে ফ্যালতে পারবে

জ্যামনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস হলেও ঐ বীণা যেন শ্যামারই সমবয়েসী। দু'জনে মন দিয়ে খেলছে। এখন কে বলবে যে ও পাগল ! আবার পাগল না হলে কী অত বড় একটা মেয়েমানুষ আঁচল কোমরে জড়িয়ে; হাঁটু পর্যন্ত শাড়ী তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে পারে ?

মায়াও হয় আবার দুশ্চিন্তাও হয়।

মেয়েটা অনেক কষ্ট পেয়েছে, অনেক বিপদ পার হয়ে এসেছে, তা ঠিক। কিন্তু কতদিন ওকে এখানে রাখা যাবে ? নিজেদের সংসারই চলে না, তার ওপর আবার একটা পেট ! তাছাড়া শুধু তো দু'মুঠো ভাত দিলেই হবে না, হাজার হোক মেয়েমানুষ, তার শরীর ঢাকার শাড়ী-সায়া দিতে হবে। তার ওপর আছে বাইরের শিয়াল-কুকুরের নজর।

বাড়িতেও তো রয়েছে দু'জন সোমত্ত পুরুষ মানুষ। পুরুষের মতি যে কখন নষ্ট হয়, তার ঠিক কী ? গতকালই লখাইয়ের মা কান ভাঙ্গানি দিতে এসেছিল।

www.BanglaBook.org

গলায় যতখানি বিষ ঢালা সম্ভব তা ঢেলে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, নিজের পায়ে কুড়ুল মারছিস, জ্যামনি ? মানলুম না হয় ও ডাকিনী-যোগিনী নয়, কিন্তু নষ্ট তো বটে ? কাঁঠাল একবার পচতে শুরু করলে পুরোটাই পচে। নষ্ট মেয়েমানুষ আর পাঁচজনকে নষ্ট না করে···তুই আগে নিজের ঘর সামলা, ভালো চাস তো ও আপদ ঝেঁটিয়ে বিদায় কর···

রান্নাঘরের দরজায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। জ্যামনি চমকে সেদিকে তাকালো।

ওমা, ওখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাবাজী। ঐ আপদটা আবার রান্না ঘরে কী করছে ? ওকে রান্নাঘরে ঘুটুর ঘুটুর করতে বারণ করা হয়েছে কতবার। অতবড় একটা ধ্যাড়েঙ্গা মানুষের যখন-তখন খিদে পায়। খিদে পেলেই হলো, এখন কিচ্ছু দেওয়া হবে না। ত্রিলোচনের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আপনে না পায় ঠাঁই শঙ্করাকে ডাকে। ঐ লোকটাকে খাতির করে বাড়িতে এনে রাখার কী মানে হয় ? জ্যামনির এটা মোটেই পছন্দ নয়। যারা নিজের সংসারের পাট তুলে দেয়, অন্যের সংসারে তাদের মানায় না। গেরুয়া ধরেছিস, মুরোদ থাকে তো সন্ন্যেসী হয়ে যা !

রান্নার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ বীণাকে দেখছে বাবাজী ! দেখতে হয় তো সামনে এসে দ্যাখ, লুকিয়ে দেখার মানেই হলো মনের মধ্যে কু আছে। ত্রিলোচন ফিরলেই আজ এই কথাটা বলতে হবে।

কাল রাত্তিরে ত্রিলোচনের কাছে মেয়েটার প্রসঙ্গ একবার তুলেছিল জ্যামনি। ত্রিলোচনের মনোভাব দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। ত্রিলোচন খিঁচিয়েও ওঠেনি, বীণার প্রতি দরদও দেখায়নি। উদাসীনভাবে বলেছিল, মেয়েটারে বিদেয় করতে চাও তো করো। আমার যেটুকু কর্তব্য ছিল করিছি, একটা মনুষ্যপ্রাণী মরতে বসেছিল, কোনোরকমে বাঁচিয়েছি। এখন তার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে ! তুমি অরে রাখতে চাও রাখো, তাড়াতে চাও তাড়াও ! তোমার সংসার তুমি বোঝো !

জ্যামনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, আমার সংসার ? আমার কোন্ কথাটা খাটে ?

ত্রিলোচন বলেছিল, রোজগার পুরুষের, সংসার মেয়েমানুষের। দ্যাখো, আমার বাপের অবস্থা ভালো ছিল না, হাতে টাকা পয়সা থাকতো না, তবু সে আমাদের ভাইবোনগুলানরে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে গেছে ঠিকই। আমিও

www.BanglaBook.org

আমার ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরার কষ্ট রাখবো না, তাতে শরীরের সব রক্ত জল হয়ে যাবে তো যাক। এটা আমার ডিউটি। এইভাবে বাপের ঋণ শোধ হবে। আমি যে-ভাবে পারি পয়সা এনে দেবো, তুমি সংসার চালাবে।

জ্যামনি চুপ করে ছিল। পুরুষ মানুষ কথার ঝোঁকে অনেক বড় বড় কথা বলে ফেলে। সারা বছর দু'বেলা পেটের ভাত জোটাবার মতন রোজগার করতে পারে না ত্রিলোচন। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। জ্যামনিকেই গুড় জ্বাল দিয়ে, গুল পাকিয়ে অতিরিক্ত উপার্জন করতে হয়। ত্রিলোচন সে কথা উল্লেখও করলো না। ছেলে-মেয়ের মা হয়ে জ্যামনি নিজের কৃতিত্বের বড়াই করতে পারে না কক্ষণো।

ত্রিলোচন আবার বলেছিল, গরিব হলেও আমার বাপ মানী লোক ছিল। নিজে না খেয়েও গরিব-দুঃখীরে ডেকে ডেকে খাওয়াতো। সেসব কী আমি ভুলে যেতে পারি ? রিক্‌শাওয়ালার বউ হলেও তুই ছোটলোক হয়ে যাসনি, সেকথা মনে রাখিস।

শুধু কথাই হলো, মীমাংসা কিছু হলো না।

বাইরে খেলতে খেলতে বীণা বলে উঠলো, এই, এই, তুই আউট ! তোর চাড়া বাইরে পড়ছে। তোর দান নষ্ট। এবার আমি···

শ্যামা রিনরিনে গলায় আপত্তি জানিয়ে বললো, না, বাইরে পড়েনি। দাগের ওপর পড়েছে। এই দ্যাখো। ঠিক দাগের ওপর।

পিঠোপিঠি বোনের মতন ওরা দুটিতে খেলছে আর ঝগড়া করছে। এই মেয়েকে কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় ?

জ্যামনি আবার বাবাজীর দিকে তাকালো, তার মুখখানা কঠোর হয়ে গেল।

জ্যামনি যে তাকে নজর করেছে, সে খেয়াল নেই বাবাজীর। সে মুগ্ধ ভাবে দেখছে জামরুল গাছের ঐ নীচের খেলার দৃশ্য।

দুটি গাছের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। লাফাতে লাফাতে বীণা একবার ছায়ায় যাচ্ছে, একবার রোদে। মাথার ভিজে চুল সব খোলা, মুখের ডৌলে মাটির প্রতিমার মতন ভাব, চক্ষুদুটি যেন উড়ন্ত ভ্রমর। বাবাজীর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। তার মাথায় একটা অন্য চিন্তা এসেছে। এই নারীই যে জোছ্‌ছনাকুমারী নয়, তা কি জোর দিয়ে বলা যায় ? সতীশ-বলাইয়ের উধাও হবার ঘটনা বাদ দিলে জোছ্‌ছনাকুমারী তো কারুর কোনো ক্ষতি করেনি। সে মাঝে মাঝে আসে গ্রামের মানুষের কল্পনা মাতিয়ে

www.BanglaBook.org

দিতে। পাঁচপেঁচি সাদামাটা জীবনে এক ঝলক জ্যোৎস্না।

এই বীণা মেয়েটি মোটেই সাধারণ কোনো মেয়ে হতে পারে না। ওর দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ধারালো মায়া আছে। এমন যার রূপ সে কেন বাড়ি ছেড়ে একা একা বেরিয়ে সীমান্ত পার হতে যাবে ? ওপারের কেউ এখনো তার খোঁজ করলো না। হাঁসের গায়ে যেমন নোংরা লাগে না, সেই রকমই দু' দু'জন পুরুষের অত্যাচার এত সহজে শরীর থেকে মুছে ফেলতে পারলো কী করে বীণা ? সাধারণ কোনো মেয়েছেলে হলে কি তিন চারদিনেই সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো ? আসলে হয়তো ঐ বদ পুরুষগুলো ওকে ছুঁতেই পারেনি। চেকপোস্টের জওয়ানটা অত ভয় পেয়েছিল কেন ? ও যে মিলিটারি, মানুষ খুন করতে ওদের চোখের পাতা কাঁপে না, ওরা ভয় পাবে সামান্য একটা মেয়েকে ? দ্যাখো গিয়ে, ওপারের বদমাসটা এতক্ষণে ওলাউঠায় মরেছে।

বাবাজীর মাথার মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ হলো। এইরকম সময়ে তার পদ্য মনে আসে। গড়বন্দীপুরের পালাটা রচনা করা অনেকখানি বাকি। বাড়িতে বসে হবে না, গুপীযন্তরটা বাজালেই যদি ওদের খেলা ভেঙে যায় ? আহা, ওরা খেলুক।

তাছাড়া বাড়িতে গান গাইতে বসলেই জ্যামনি তাকে কোনো না কোনো কাজ দেয়। হয়তো এখন আখা ধরাবার হুকুম দিয়ে বসবে। এখনো রান্নার কোনো উদযোগ নেই, আজ কি চাল বাড়ন্ত নাকি ?

গুপী যন্ত্রটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাবাজী।

পিড়িং পিড়িং করে বাজাতে বাজাতে সে শিবমন্দিরের পেছন দিক দিয়ে নদীর ঘাটে চলে এলো। এখনো কোনো লাইন মনে পড়ছে না। জোছনাকুমারীর কথা ভাবতে ভাবতে যেই জ্যামনির কথা মনে পড়লো, অমনি সুর কেটে গেল। জ্যামনিকে সে ভয় পায়।

জ্যামনির সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি বাবাজী, তবু জ্যামনি কোনো দিন নিজের থেকে একবারও হেসে কথা বলে না তার সঙ্গে, বরং বাবাজীর মস্করা শুনলে রাগ রাগ চোখ করে তাকায়। বাবাজী এ বাড়িতে পাকাপাকি আসবার অনেক আগে থেকেই এরকম। এক একজন মানুষ বোধহয় গোড়া থেকেই কারুকে একবার অপছন্দ করে বসলে তারপর আর কিছুতেই মনের ভাব বদলায় না। দুনিয়ায় কেউ কি সকলের মন পায় ?

নতুন পদ মাথায় আসছে না, পুরোনো দুটো লাইনই মনে পড়ছে।

www.BanglaBook.org

সুখ আর দুঃখ যেন যমজ দুইটি ভাই
কখন কে যে দাঁড়ায় পাশে চেনার উপায় নাই
আহা যমজ দুইটি ভাই...

বৃষ্টিতে নদীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। আজ একাদশী। লোকজন যাওয়া-আসা করছে শিবমন্দিরে। ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে। মনে হয় এখন কোথাও কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু জ্যামনি আজ সকালে আখা ধরায়নি কেন? সকালবেলা দু'খানা করে বাসি রুটি খাওয়া হয়েছে শুধু। জ্যামনি তো চাল জোগাড় করে আনার কথাও কিছু বললো না।

খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছে গোষ্ঠবিহারী, হাতে তার একটা কাটা পাঁঠার মুণ্ডু। কেউ বোধহয় পাঁঠা মানত করেছিল মা কালীর থানে। বলি দেবার হকদার গোষ্ঠবিহারী, হাঁড়িকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে সে খাঁড়াখানা কপালে ছুইয়ে পাক্কা পাঁচ মিনিট মন্ত্র পড়ে। তারপর এক কোপে অবোলা প্রাণীটার ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেয়। এই বাবদে মুণ্ডুটা তার প্রাপ্য হয়।

গোষ্ঠবিহারীকে দেখে বাবাজীর বুকে ছোটখাটো একটা ভূমিকম্প হলো। সেদিনের ব্যাপারে গোষ্ঠবিহারী এখনো ক্ষেপে আছে। অতগুলো গ্রামের মানুষের সামনে ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরী তাকে খুব ধমকেছিল। নারী-নির্যাতনের অভিযোগে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে শাসিয়েছিল। কলকাতার ডাক্তারের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি গোষ্ঠবিহারী, কিন্তু সুযোগ পেলেই তাদের ওপর শোধ নেবে। তাও ত্রিলোচনকে সহজে কাবু করতে পারবে না, ত্রিলোচনও কম বদরাগী নয়, সুতরাং বাবাজীর ওপরেই কোনো একদিন মেজাজ ঝাড়বে গোষ্ঠবিহারী। সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। খাঁড়ার কোপই না বসিয়ে দেয় একদিন বাবাজীর ঘাড়ে।

বাবাজীর গলা থেকে গান শুকিয়ে গেল, মন থেকে পদ্য উপে গেল।

গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে এক খেয়ায় যেতে সাহস হলো না তার, সে বড় শিরীষ গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরালো। যদিও দিনের আলো, চারপাশে অনেক মানুষজন, তবু গোষ্ঠবিহারীর কাছাকাছি আবার দরকারটা কী!

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ঠেলা দিল একটা। বাবাজী ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো কেতুকে। লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা কেতুর মুখখানা বাবাজীর চেয়ে অন্তত আধ হাত উঁচুতে। ঠোঁটে হাসি, চোখের মণিতে সব সময় কোনো ধূর্ত পরিকল্পনা।

www.BanglaBook.org

বাবাজীর কাঁধে একখানা চাপড় মেরে কেতু বললো, ব্রজেন মাস্টারমশায়ের কাছে কবে যাবে, পেনুদা ? তোমার কথা বলে রেখিছি। স্যার রাজি হইয়েছেন, খাতায় তোমার নাম তুলে নিয়েছেন, কিন্তু আগে একদিন গান শোনাও !

বাবাজী ফ্যাকাশে ভাবে বললো, গানটা এখনো পুরো বাঁধা হয়নি। এখনো দেরি রয়েছে তো।

কেতু বললো, দেরি বলে বসে থাকলে কী হয়। হুট করে দেখবে একদিন পার হয়ে গেল। আগেকার দিন কী আছে, যখন সব গোরুর গাড়ির মতন টিকিস টিকিস করে চইল্‌তা। এখন দিন কাল রেলগাড়ির মতন ছুইটতেছে ! কবে যাবে বলো !

—দেখি !

—বেশি দেরি করলে সব নাম ফিল-আপ হয়ে যাবে কিন্তুক। তখন আমায় দোষ দিওনি !

কেতু নিজে থেকেই এত গরজ দেখাচ্ছে, নিশ্চয় ওর অন্য কিছু মতলোব আছে। আগের দিন যে টাকা ধার নিল, সে সম্পর্কে উচ্চবাচ্য নেই। ও ব্যাপারে কেতু একেবারে নির্লজ্জ। নির্লজ্জ মানুষও এমন হাসিমুখে কথা বলতে পারে !

তবে একটা ব্যাপারে বাবাজী নিশ্চিন্ত। আজ কেতু ধার চাইলে ঠকে যাবে। পাঁচটা বিড়ি ছাড়া বাবাজীর ট্যাঁকে আর কিছুই নেই।

—চলো, ওপারে যাবে তো ? তোমার রেক্‌শায় আমি বাজার পর্যন্ত যাবো !

মুখ দেখেই কি কেতু বুঝেছে যে বাবাজীর কাছে পয়সা নেই ? তাই সে বিনা পয়সায় রিক্‌শা চড়ে নিতে চায়। সে গুড়েও বালি। আজ কেতুকে বেশ জব্দ করা গেছে।

বাবাজীও হেসে বললো, এবেলা রিক্‌শা নিয়ে ত্রিলোচন বেরিয়েছে। আমি এমনি একটু ওদিকপানে যাচ্ছি।

কেতুর জন্য সেই গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে এক খেয়াতেই পার হতে হলো। তবে গোষ্ঠবিহারী গ্রাহ্যই করলো না বাবাজীকে। একখানা পাঠার মুড়ো পেয়ে তার মেজাজটি মনে হয় ভালো আছে। গাঁজায় দমও পুরো হয়নি।

ওপারে পৌঁছেই কেতু বললো, একটু চা হবে নাকি, পেনুদা ?

কিছু না কিছু না নিয়ে কেতু ছাড়বে না। কালাচাঁদের দোকানে বাবাজী ধারেও চা খেতে পারে, সে খবরও কেতু রাখে। না বলার উপায় নেই। একেই বলে গ্রহের ফের। কেতুর জন্যই বাবাজীকে কালাচাঁদের দোকানে বসতে হলো, নইলে

www.BanglaBook.org

তার ইচ্ছে ছিল না।

দু'খানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেয়ে, চা-টা হুসহাস করে খেয়ে কেতু প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। বাবাজী অত গরম চা খেতে পারে না, তার সময় লাগে।

বাঁশের খুঁটির ওপর কঞ্চি সেঁটে বেঞ্চ হয়েছে দু'সারি। বাবাজীর মুখোমুখি বসে আছে তিন চারজন। এদের মধ্যে জগাই আর দাসু সেই সন্ধেবেলার তাণ্ডবে গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে ছিল। বাবাজী মুখ নামিয়ে রেখেছে, ওদের সঙ্গে চোখাচোখি করতে চায় না।

জগাই-ই প্রথম শুরু করলো। চায়ের গেলাশটা উপুড় করে শেষ ফোঁটাগুলো মাটিয়ে ফেলতে ফেলতে সে বললো, ও দাড়িওয়ালা বাবাজী, মেয়েমানুষটাকে বাড়িতেই রেখে দিলে বুঝি ? ও কার ভাগে পড়লো, তোমার না তেলোচনের ?

দাসু বললো, দু'জনে ভাগাভাগি করে নিলেই বা ক্ষতি কী ? ফোঁকটে যা পাওয়া যায় !

জগাই বললো, হিন্দু না মোছলমান তার ঠিক নাই। ছি ছি ছি ছি, জাত ধম্মো আর রইলো না। আমাদের বাপ-দাদার আমল হলে জুতিয়ে খাল খিচে দিত। কী বলবো, এখন সমাজের মাথাগুলোই কইলকেতা গিয়ে বসে আছে।

দাসু বললো, হিন্দু হলেই বা কী ? নিশ্চয় কোনো অজাত-কুজাত। জয়-বাংলায় তো অরাই থাকে। খানকী না হলে একা একা বর্ডার পার হয়ে আসে ?

জগাই বললো, হাসপাতালের ডাক্তারটার যখন অত রস তখন ও মেয়েমানুষটাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখলেই পারতো !

বেঞ্চের কোণের দিকে একটা রোগা মতন ছোকরা বসে আছে। সে হঠাৎ ফুঁসে উঠে বললো, আপনারা অত টিপ্পনী কাটছেন কেন ? বেশ করেছে, মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছে। না হলে মেয়েটা শুধু শুধু মারা পড়তো, সেটা ভালো হতো ? আপনারা কোনোদিন একটা কুটো নেড়েও কারুকে সাহায্য করেছেন ? সেদিন বলছিলেন মেয়েটা পেতনী না ডাকিনী, আজ শুরু করেছেন জাত পাঁতের কুটকচালি !

বাবাজী হকচকিয়ে গেল। দুনিয়ার কোন দিক থেকে যে কখন অপ্রত্যাশিত সাহায্য আসে, তার কোনো ঠিক নেই। এই কালো মতন রোগা ছেলেটা কাদের বাড়ির তাই বা কে জানে ! বোধহয় ছোট থেকে হঠাৎ বড় হয়ে উঠেছে, তাই

www.BanglaBook.org

চেনা যাচ্ছে না। জগাই আর দাসু দু'জনেই মাঝবয়েসী মুরুব্বি গোছের মানুষ, তাদের মুখের ওপর চোটপাট করে উঠলো ঐটুকু একটা ছেলে, তাও অযাচিতভাবে অপরের সমর্থনে ? এইজন্যই এখনো চন্দ্র সূর্য ঘোরে।

জগাই বা দাসু কিন্তু আর বিশেষ তর্কের মধ্যে গেল না। পরনিন্দা এমনই জিনিস, যত সমর্থন পায় ততই লকলকিয়ে বাড়ে, একটু প্রতিবাদের মুখোমুখি হলেই চুপসে যায়।

কিন্তু বাবাজী জানে, কথায় যারা হেরে যায়, তারা কাজে বেশি শত্রুতা করে। জগাই আর দাসু এখান থেকে উঠে গিয়েই বিষ ছড়াতে শুরু করবে। ওরা গিয়ে এখন একবার দেখে আসুক না। ভিনদেশী মেয়েটা বাচ্চা মেয়ে শ্যামার সঙ্গে কীভাবে খেলা করছে। তা দেখেও ওদের মায়া হবে না ?

জগাই আর দাসুকে একটু খুশী করার জন্য বাবাজী এবার একটা বিনীত হাসি দিয়ে বললো, না গো, ওরে আমরা আর কতদিন রাখবো ? নেহাৎ ত্রিলোচনের চোখে পড়েছিল যে মেয়েটা ধুঁকছে··· তা ডাক্তারবাবু থানায় খপর দিয়েছেন, পুলিশ এইসে ওরে নিয়ে যাবে।

জগাই আর দাসু অবহেলার সঙ্গে মুখ ব্যাঁকালো। গ্রামের মধ্যে পুলিস আসাটাই তাদের পছন্দ নয়। যারা গ্রামে পুলিস টেনে আনে, তারা গ্রামের শত্রু। তার চেয়ে মেয়েটাকে আগেই খেদিয়ে বর্ডার পার করে দিলে সব ঝামেলা চুকে যেত না ?

বাবাজী উঠে পড়ে সকলের দিকে চেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, আসি গো !

কালাচাঁদ বললো, আশি নয়া।

বাবাজী বললো, লিখে রাখো। হপ্তার শেষে সব শোধ করে দোবো।

কালাচাঁদ বললো, নাগো, প্রাণকেষ্ট, আর আমি ধার-বাকি রাখতে পারবো না। নগ্‌দা দিয়ে যাও।

বাবাজী রীতিমতন অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। কালাচাঁদের সঙ্গে তার ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক, সে আজ এ কী সুরে কথা বলছে ? বাবাজী কোনোদিন তার কাছে ধার ফেলে রাখে না।

কালাচাঁদ মুদিখানার পাটাতন থেকে নেমে এসে গোমড়া মুখে বললো, একটু এদিকে এসো তো প্রাণকেষ্ট, তোমার সঙ্গে আর একটা কথা আছে।

আজ যেন সবাই মিলে বাবাজীকে চারদিক থেকে খোঁচাবে ঠিক করেছে। বাড়ির কর্তা ত্রিলোচন, সাইকেলরিকশার মালিক ত্রিলোচন, মেয়েটাকেও

www.BanglaBook.org

ত্রিলোচনই উদ্ধার করে এনেছে, গোষ্ঠবিহারীর গালে সে-ই চড় মেরেছিল, তোমাদের কিছু বলার থাকে তো ত্রিলোচনকে শোনাও ! বাবাজী তো শুধু নিমিত্তের ভাগী ।

কালাচাঁদ রাস্তার ওপর খানিকটা সরে এসে বললো, শোনো, তোমাদের সাইকেল রেক্সা আর আমার এখানে গ্যারেজ করা চলবেনি । তোমরা অন্য জ্যায়গা দেখে নাও আজ থেকে । ওখানে আমি কয়লা রাখবো ।

বাবাজী বললো, এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যে খোলা জ্যায়গায় কয়লা রাখবে কি গো ? ভিজে যে ঝুপসি হয়ে যাবে ।

কালাচাঁদ বললো, সে আমি বুঝবো । ও জ্যায়গা আমার অন্য কাজে লাগবে !

—এখনো তো অন্য কাজে লাগাওনি । এই বর্ষাটা কাটুক, তারপর

—না, আজ থেকেই সরাও !

—কেন গো, কালাচাঁদ । হঠাৎ রেগে গেলে কেন, কী দোষ করলুম তোমার সাথে ? পয়সা ঠিক মতন পাও না !

—আঃ, অত কথার দরকার কী ! বলছি তো, আমার কাজে লাগবে ।

—তার মানে কেউ তোমার ওপর চাপ দিয়েছে । তা সকালে ত্রিলোচন যখন গাড়ি নিয়ে গেল, তখন তাকে বলোনি ?

—না, তখন মনে ছিল না । তুমি তারে ব্যবস্থা করতে বলে দাও !

কালাচাঁদের মুখ দিয়ে যেন অন্য কেউ কথা বলছে । তাকে একটু নরম করার জন্য বাবাজী একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও ।

কালাচাঁদ এমনভাবে নাঃ বললো, যেন বিড়ি তো সে নেবেই না, বাবাজীর স্পর্শও সে বাঁচিয়ে চলতে চায় । ওরে বাবা, এতদূর !

বাবাজী কাঁচুমাচু হয়ে বললো, পয়সা আনিনি, চায়ের দাম যে দিতে পারছিনি দাদা !

কালাচাঁদ বললো, নিজের হাতে পয়সা নেই, তবে আবার অন্যকে খাওয়াবার শখ কেন ? কেতুর চা-বিস্কুটের দাম তুমিই দেবে তো ? মনে করে কাল সকালে দিয়ে যেও !

বাবাজী হাঁটা দিল বড় রাস্তার দিকে । অন্য লোকে ব্যস্ততা থাকলে হনহনিয়ে হাঁটে, সে খোঁড়া পায়ে বেশি গতি আনতে পারে না । ত্রিলোচনকে খবরটা আগেই দেওয়া দরকার । সারাদিন খেটেখুটে আসার পর এই কথা শুনলে তার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যাবে ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে হবে অনেক দূর, সেই স্টেশান-বাজারের কাছে। গুপী যন্তরটা শুধু শুধু সঙ্গে আনাই সার হলো। গান মাথায় উঠে গেছে। বাবাজী লক্ষ করেছে, আজকাল বেশির ভাগ লোকই এমন ব্যবহার করে যাতে গান নষ্ট হয়ে যায়, সুর কেটে যায়। দুনিয়াটা কী হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

হাঁটতে আপত্তি নেই বাবাজীর, কিন্তু হাতে যন্তরটা রয়েছে বলে একটু লজ্জা করছে। এমনভাবে বড় রাস্তা দিয়ে সে ফকির-বাউলের মতন কোনোদিন যায়নি। পেটে নেই বিদ্যে, ধর্মের গুহ্য কথা কিছুই বোঝে না, শুধু গেরুয়া ধারণ করলেই কি ফকির-বাউল হওয়া যায়? দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলো বাবাজী, ভেবেছিল আর কোনোদিন কামাবে না, এখন মনে হচ্ছে বড় কুটকুট করে, এখন কেটে ফেললেই ভালো। ঐ বীণা বোধহয় তার দাড়ি দেখলেই ভয় পেয়ে যায়। বাবাজী তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে সিঁটিয়ে থাকে। একটা শব্দও বার করে না।

উল্টোদিক থেকে একটা মোটর সাইকেল আসছে। কী শব্দের দাপট। শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, এ হচ্ছে তেজী মানুষের গাড়ি। চোখে কালো চশমা, গায়ে একটা চামড়ার জামা, ঠোঁটে চুরুট, তবু বাবাজী চিনতে পারলো, এ হচ্ছে ভূপেন গড়াইয়ের ছেলে কেষ্ট। তা বাপের পরিচয় দেবার দরকারই বা কী, কেষ্ট গড়াই নিজেই এখন কেউকেটা। কী করে যে তার পয়সা হচ্ছে তা প্রকাশ্যে কিছুই দেখা যায় না, সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়।

হু-ড়-ড়-ড়-ড় গর্জন করতে করতে মটোর সাইকেলটা থেমে গেল। চোখ থেকে চশমা খুলে কেষ্ট বললো, এই যে, এই তুই শোন!

আবার বাবাজীর মুখ শুকিয়ে গেল। আজ কী শুরু হলো। এই কেষ্ট একদিন ভাড়া নিয়ে দরাদরি করে বাবাজীকে গলাধাক্কা দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত একটা পয়সাও দেয়নি। তা নিয়ে বাবাজী কি নালিশ জানাতে গেছে কারুর কাছে। অন্য সব রিকশাওয়ালাদের বলে দিলে সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে কি একটা ব্যবস্থা করা যেত না? আজকাল গায়ে হাত দিয়ে কেউ পার পায় না। তবু বাবাজী কিছু বলেনি। মোটে তো চার পাঁচটা টাকা। শুধু শুধু রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করলে যত ক্ষতি হয়, তার দাম টাকা দিয়ে হিসেব করা যায় না। এর পর আর কোনোদিন কেষ্টকে সওয়ারি না নিলেই হয়।

কেষ্টকে বাবাজী ঠিকই চিনে রেখেছে, কিন্তু কেষ্টর তো তাকে চেনবার কথা নয়। সে অনেকের মধ্যে একজন রিকশাওয়ালা মাত্র, রিক্সাওয়ালাদের মুখ কে

www.BanglaBook.org

মনে রাখে ?

কেষ্ট বললো, এই, তুই রিকশা চালাস তো ? তোর রিকশা কোথায় ?

বাবাজী বললো, আইজ্ঞে, এখন অন্য একজন চালাইছে।

কেষ্ট বাবাজীর দিকে কয়েক পলক মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে বললো, ঠিক আছে, সন্ধের সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা করবি। কিছু মাল নিয়ে বর্ডারে যেতে হবে।

একটা দশ টাকার নোট টুসকি মেরে রাস্তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে কেষ্ট আবার তার গর্জন-গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। বাবাজীকে কোনো কথা বলার সুযোগই দিল না।

রাস্তার ওপর টাকা ফেলে রাখতে নেই। তাতে টাকার অপমান হয়। টাকার অপমান বড় ভয়ের, একবার যদি ওরা বেঁকে বসে তাহলে কোনোদিন আর ঘরে একটা টাকাও থাকবে না।

এটা কি সেই আগের দিনের না-দেওয়া ভাড়া, না আজ সন্ধ্যার জন্য অগ্রিম ? সন্ধ্যার সময় বাবাজী বর্ডারে মাল পৌঁছে দিতে যাবে কোন্ দুঃখে ? সে কিংবা ত্রিলোচন এসব কারবার করে না। তারজন্য অন্য লোক আছে। তবু কেষ্ট হঠাৎ আজ বাবাজীকেই বাছলো কেন ?

টাকাটা রাস্তায় ফেলে রেখে গেলেও কোনো লাভ নেই। কেষ্ট কি তা বিশ্বাস করবে ?

খুবই দ্বিধান্বিত ও অপমানিত ভঙ্গিতে বাবাজী টাকাটা বাঁ হাতে কুড়িয়ে নিল। এই ব্যাপারেও ত্রিলোচনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

ডান হাতের গুপীযন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বাবাজী নিজেকে ছিঃ করে বললো, তুমি আজ গান বাঁধার জন্য বেরিয়েছিলে, তার বদলে তুমি একটা বদ লোকের টাকা ট্যাঁকে গুঁজলে ? নিজেই আবার সে উত্তর দিল, কী করবো বলো ? অভাব বড় বালাই। সামনে ঘোর বর্ষা আসছে, তখন দিনের পর দিন সওয়ারি জুটবে না। রোজগার বন্ধ। বাড়িতে আবার একজন অতিথি। দশ টাকার নোট সামনে পড়ে থাকতেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে পারে, এমন নির্লোভ মানুষ ক'জন আছে বলো না !

স্টেশনের সামনের চত্বরে পাওয়া গেল ত্রিলোচনকে। দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরে সীটের ওপর সে সোজা হয়ে বসে আছে। যেন সে একজন সাইকেলরিক্সাচালক নয়, সে একজন ঘোড়সওয়ার। তার মুখে ভাদ্রমাসের মেঘের মতন অভিমান।

www.BanglaBook.org

আর একটাও রিকশা সেখানে নেই, ত্রিলোচন একা।

বাবাজীকে দেখেই ত্রিলোচন বললো, তুই একবার থানায় যা!

এ আবার কী অদ্ভুত কথা। বাবাজী হঠাৎ শুধু শুধু থানায় যেতে যাবে কেন? থানা কি নদীর ঘাট, না রেল স্টেশন, যখন তখন সেখানে গেলেই হলো!

মুখ আমসি করে বাবাজী বললো, কেন, আমায় ডেকেছে নাকি? আমি কী দোষ করিছি?

ত্রিলোচন ধমক দিয়ে বললো, থানায় গিয়ে বড়বাবুকে বল, ঐ মেয়েমানুষটাকে আমাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসতে। আমরা আর কতদিন অরে রাখবো?

বাবাজী স্তম্ভিত হয়ে গেল। ত্রিলোচনের মুখে এই কথা? একদল গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ত্রিলোচন ঐ মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য। এখন সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে দূর করে দিতে চাইছে? ঐ যুবতী মেয়ে থানায় গিয়ে পড়লে তার কী অবস্থা হবে, তা একটা জড়ভরতও বুঝতে পারে। চেকপোস্টের একজন জওয়ান যাকে খেয়েছে, থানায় পাঁচজনে তাকে ঠোকরাবে। এই তো মোটে কয়েকমাস আগে নকুল সাউকে পুলিশ গ্রেফতার করে হাজতে রাখলো, পরের দিন সে মরে গেল। নকুল সাউ চোর ছিল বটে, কিন্তু কোনো চোর কি এক রাত্তিরে মরে? চোরদেরই তো আরও কড়া জান হয়।

বাবাজী বললো, ডাক্তারবাবু তো থানায় রিপোর্ট করিছিলেন, আবার আমাদের যাওনের কী দরকার?

ত্রিলোচন চোখ গরম করে তাকিয়ে রইলো। তারা দু'জনেই জানে যে দারোগাবাবু সে সময় বলেছিল, তার যখন সময় হবে, তখন যাবে। নলবান্দা গ্রামের ডাকাতির কেস নিয়ে থানা-পুলিশ এখন ব্যস্ত।

বাবাজী মিনমিন করে বললো, আমি একলা যাবো? আমার কথা সে শুনবে?

ত্রিলোচন বললো, আমারে রোজগার করতে হবে না? সকাল থেকে একটা মাত্র সওয়ারি পেয়িছি। বাঁধা খদ্দেররা অন্য গাড়িতে উঠে যাচ্ছে। একজন টিটকিরি দিয়ে গেল। সব ঐ অপয়া মেয়েটার জন্য।

এরপর আর কথা চলে না। লোকজন ক্ষেপে গেলে রিকশাওয়ালার সর্বনাশ। একবার শ্রীধর একজন বাবুকে 'আপনার মতন ছোটলোক আর দিখিনি' বলে ফেলায় কী কাণ্ডই না হয়েছিল, সেই বাবু এমন চ্যাঁচামেচি করলো যে ভিড়

www.BanglaBook.org

জমে গেল। ভদ্দরলোকেরা কখনো ছোটলোক হতে পারে না, রিকশাওয়ালাদেরই সব সময় দোষ। শ্রীধর তো চড় চাপড় খেলই, তারপর আর একমাস কেউ তার রিকশায় চাপেনি, ইস্কুলের দুটো বাচ্চাকে সে নিয়ে যেত, তাকেও ছাড়িয়ে দিল। শ্রীধরের না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা, শেষ পর্যন্ত সে জনেজনে ক্ষমা চাইতে লাগলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বাবাজী একটা বিড়ি ধরালো। দূর ছাই, এরকম বিপদের সময় বিড়িতেও স্বাদ পাওয়া যায় না।

সেই শ্রীধরই তক্ষণি সেখানে এলো ফাঁকা রিকশা নিয়ে। উল্টোদিকের প্যাডেল ঘোরাবার শব্দ করতে করতে সে ত্রিলোচনকে বললো, যাও, তোমারে রাজেন ঘোষ ডাকতেছে।

ত্রিলোচন ভূরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ডাকতেছে মানে ? ভাড়ায় যাবে ?

শ্রীধর পিক করে মাটিতে থুতু ফেলে বললো, আরে নাঃ, ভাড়া যাবার হলে তো আমারেই নিত। ঘোষবাবুর বাড়ির সামনে অনেকে গুলতানি করতেছে দ্যাখলাম, আমারে বললো, ত্রিলোচনরে এখানে পাঠায়ে দে !

ত্রিলোচন বলল, ডাকলেই যেতে হবে ? কেন যাবো ?

ত্রিলোচন বেকায়দায় পড়েছে বলে শ্রীধর বেশ মজা পেয়েছে। সে ফিক করে হেসে বললো, নতুন পয়সা হয়েছে রাজেন ঘোষের, তাই এখন সে সমাজের মাথা হইতে চায়। তুই বাড়িতে মেয়েমানুষ রাখছোস, তাই ক্ষ্যাইপা গেছে। আরে মেয়েমানুষ পোষার হক তো বড় মানুষের। এখন তোর বিচার হবে।

ত্রিলোচন বাবাজীর দিকে ফিরে বললো, চল, আমরা দুইজনেই থানায় যাই !

॥ ৭ ॥

নদীর ধারে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে বিষ্টু। পাশে তার বই খাতা। ইস্কুল ছুটির আগেই সে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার মন নেই, টুকরো টুকরো ইঁট ছুঁড়ে দিচ্ছে নদীর জলে। তাতে যে তরঙ্গ ওঠে তা ঠিক কিশোর বয়েসের অভিযানের মতন।

ক্লাস টেনের ছেলেরা আজ তাকে ঘিরেছে।

প্রথমে শুরু করেছিল খারাপ কথা দিয়ে। তার বাপের নামে খারাপ কথা। আশ্চর্য ব্যাপার, আসল ঘটনা যা ঘটে, গুজব ছড়ায় ঠিক তার উল্টো। সেকেন্ড পীরিয়াডে পেচ্ছাপখানার ধারে তিনটে ঢ্যাঙা ছেলে বিষ্টুকে ঘিরে ধরে বললো,

www.BanglaBook.org

হ্যাঁরে, তোর বাবা জয় বাংলার বর্ডারের ওপাশ থেকে একটা মোটকা সোটকা মেয়েকে জোর করে ধরে এনেছে, নারে ?

একটা পাঁঠা কিংবা মুর্গীর যে-কারণে মোটকা সোটকা হলেই দাম বাড়ে, মেয়েটি সম্পর্কে তারা ঠিক সেই ইঙ্গিতই করে। শুধু মুখের কথায় নয়, হাত দিয়েও বোঝায় !

বিষ্টুর বাবা সাইকেল রিকশা চালায়, সেজন্য তার একটুও লজ্জা নেই। ত্রিলোচন প্রায়ই ছেলেকে বলে, সব সময় মনে রাখবি, তুই কবিয়াল মনোহর সাঁতরার নাতি। সব সময় মাথা উঁচু করে চলবি। বিষ্টু তার বাবাকেও শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। বাবা রগচটা রাগী মানুষ, কিন্তু তার স্নেহেরও কোনো ঘাটতি নেই। আর কোনো রিকশাওয়ালা তো ছেলেকে ইস্কুলে পাঠায় না।

বিষ্টু যত প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, ক্লাস টেনের ছেলেগুলো ততই মজা পেতে লাগলো। খারাপ কথাগুলো আরও কুৎসিত হতে শুরু করলো। ওদের মধ্যে একটা মাত্র ছেলে ছিল ভালো, সে থামাবার চেষ্টা করলেও কেউ শুনলো না। দশজনের মধ্যে একজন মোটে ভালো বলে তার গলা সবসময় চাপা পড়ে যায়। দু'তিনজন বিষ্টুর মাথায় চাঁটা মারছিল, রাগের চোটে বিষ্টু একজনকে ঠেলে দিতেই অন্যরা তাকে পেটাতে লাগলো, বিষ্টু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ইস্কুলের একটা অলিখিত নিয়ম আছে, অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি হলেও তা নিয়ে স্যারদের কাছে নালিশ করা চলবে না। আজকের মারামারি কালকে ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু স্যারদের কাছে নালিশ করে কারুকে শাস্তি দেওয়ালে তা অনেকদূর গড়াবে।

এমনিতো মারামারি প্রায়ই হয়। কিন্তু আজ ওরা তার বাবার নামে এত খারাপ কথা বলছিল বলে অসম্ভব মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল বিষ্টুর। এক সময় তার ইচ্ছে হয়েছিল, সাধন নামের সবচেয়ে বদমাইস ছেলেটাকে খুন করে ফেলতে। একটা থান ইঁট দিয়ে মাথাটা থেঁৎলে দিতে পারতো। কিন্তু ঐ সাধন হলো কেষ্ট গড়াইয়ের ছোট ভাই, তার পকেটে পয়সা ঝনঝন করে, তার দলে অনেক ছেলে আছে, তারা বিষ্টুকে ঠেলতে ঠেলতে ফেলে দিয়েছে কচুগাছগুলোর মধ্যে।

বাঁ কনুইয়ের নুন ছাল উঠে গেছে বিষ্টুর, নাক দিয়ে গরম জলের মতন রক্ত বেরিয়েছিল, সে আর ক্লাসে ফিরে যায়নি। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে এতটা রাস্তা দৌড়ে এসেছে।

www.BanglaBook.org

এখন রাগের বদলে তার বুক জোড়া জমাট অভিমান।

বাড়ি না ফিরে সে নদীর ধারে বসে ভাবছে নিজের বাড়ির কথা। বৃষ্টির দিনে তার বাবা লখাইদার বউয়ের বয়েসী একজন মেয়েছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এলো। গ্রামের লোক তাকে ডাকিনী বলে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, তার বাবা আর সাধুকাকা মিলে তাকে বাঁচিয়েছে। একজন মানুষকে মারা ভালো, না বাঁচানো ভালো ? যে বাঁচায়, তার নামেই লোকে খারাপ কথা বলে ? শুধু ইস্কুলের ছেলেরা না, দামড়া দামড়া লোকেরাও তো বলে। কালাচাঁদের চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় জগাই জ্যাঠা বলেছিল, এই ত্রিলোচনের ছেলে, রাত্তিরে এখন তোরা কোথায় শুস রে ? ঘরে তো জায়গা হয় না, ঘরের মধ্যে তোর বাপ দুই বউ নিয়ে শুয়ে থাকে !

মিথ্যে কথা। ত্রিলোচন এখন বাবাজীর সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘুমোয়। তবু কেন লোকে এমন বানায় ? গোষ্ঠবিহারী যে ভুল করে মেয়েটাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল আর একটু হলে, কই, তার নামে তো কেউ খারাপ কথা বলে না !

তা হলে পৃথিবীর নিয়মটা কী ?

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করেও বিষ্টু এর কোনো উত্তর পায় না। বইতে একরকম কথা লেখা অথচ মানুষ অন্যরকম ব্যবহার করে।

তিনটি যুবতী মেয়ে খেয়া নৌকো পার হয়ে এদিকে এলো, তাদের মধ্যে একজন বিষ্টুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুই সাঁতরা বাড়ির ছেলে না ?

যুবতীটিকে চেনে বিষ্টু, কায়স্থদের বাড়ির মেয়ে, এর নাম গোপা, কলেজে পড়ে। অন্য দুটি মেয়েও তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

গোপা তার সঙ্গিনীদের বললো, এদের বাড়িতেই জয়বাংলার একটা মেয়েকে ডাকিনী বলে পুড়িয়ে মারছিল। দেশের কি অবস্থা ভেবে দ্যাখ।

বিষ্টুর ইচ্ছে হলো, রুখে উঠে বলে, আমরা মোটেই তাকে পুড়িয়ে মারতে যাইনি ! কিন্তু অভিমানে তার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

অন্য একটি মেয়ে বললো, কাগজে পড়েছি, পুরুলিয়ায় প্রায়ই ডাইনী বলে বুড়িদের পুড়িয়ে মেরে ফ্যালে। আমাদের এদিকেও এরকম হয় ?

গোপা বললো, এক একটা যা লোক আছে না, হরিবল। তারা এমন সব বাজে বাজে গুজব ছড়ায় ! এর আগে একবার গুজব রটেছিল, সতীশ আর বলাই বলে দুটো গ্যাঁটাগোট্টা ছেলেকে কোন্ পেতনী নাকি খেয়ে ফেলেছে ! আমাদের

www.BanglaBook.org

একজন স্যার নিজের চোখে দেখেছে যে তারা কলকাতার শেয়ালদা স্টেশনে খবরের কাগজ বিক্রি করে, তবু এরা কেউ তা বিশ্বাস করবে না।

তৃতীয় মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, জয় বাংলার মেয়েটার গায়ে সত্যি সত্যি আগুন লাগিয়েছিল ? কেউ পুলিশে খবর দেয়নি ?

গোপা বললো, মব ফ্রেনজি-তে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এর বাবা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছে। এর বাবা রিকশা চালায়, লেখাপড়া তো জানে না, তবু দ্যাখ তারও একটা বিবেক বুদ্ধি আছে। সাহস আছে।

বিষ্টু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। এরা নিন্দে করতে আসেনি, তার বাবাকে প্রশংসা করতে এসেছে ? পিতৃনিন্দা শুনে তার শুধু রাগ হয়েছিল, এখন সমবেদনার কথা শুনে তার চোখে জল এসে গেল।

একটি মেয়ে বললো, এখনো ভাই গরিবদের মধ্যে অনেক সততা আছে। এরা মেয়েটিকে খাইয়ে পরিয়ে বাড়িতে রেখেছে, আমাদের উচিত কিছু চাঁদা তুলে এদের সাহায্য করা।

আর একটি মেয়ে বললো, চল না, আজ ক্লাসের সবাইকে বলবো, কিছু টাকা ঠিক তুলে ফেলা যাবে।

গোপা বললো, আমাদের এখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন করা দরকার। গ্রামের মেয়েদের ওপর যা অত্যাচার হয়, আমরা একটা কিছু ব্যবস্থা না নিলে··· তোরা জানিস, এই এরিয়ায় বছরে চার-পাঁচটা রেপ কেস হয় ? আরও কত কেসের কথা লোকে জানতেই পারে না !

একজন বললো, এই জয়বাংলার মেয়েটাকেও তো শুনেছি··· সে এখন কেমন আছে ?

গোপা বিষ্টুকে জিজ্ঞেস করলো, এই ছেলে, সে এখন কেমন আছে রে ? সুস্থ হয়েছে ?

বিষ্টু এবার মাথা নাড়লো।

একজন বললো, এখানকার হেল্‌থ সেন্টারের নতুন ডাক্তারটি নাকি ওর জন্য অনেক করেছে !

আর একজন বললো, হ্যাঁরে। ডাক্তারটা খুব ভালো, দেখতেও দারুণ, অনেকটা ঋষি কাপুরের মতন। শুনেছি ব্যাচিলর।

গোপা তাকে বললো, তোর তো প্রায়ই জ্বর হয়, ঐ ডাক্তারকে দেখাতে যাবি নাকি ?

www.BanglaBook.org

তিন বান্ধবী এরপরে হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল।

বিষ্টু আবার গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো। সে জানে, তাদের অভাবের সংসার। এই বর্ষার সময়টাতেই তার বাবার রোজগার কমে যায়। এখন অনেকেই কাজ করতে যায় মাঠে। তাদের কোনো জমি নেই। যতদিন ফসল না উঠছে ততদিন লোকের হাতে টাকা থাকে না, রিকশাও চট করে নেয় না। এই সময় তাদের বাড়িতে ভাতের টান পড়ে। এর ওপর জয় বাংলার মেয়েটিকে খাওয়াতে হবে। কী করে চলবে ?

কায়স্থবাড়ির গোপাদিদিমণি বলে গেল, তারা চাঁদা তুলে দেবে। এত ভালো কথা বিষ্টু কখনো শোনেনি। কিন্তু তার মনে সন্দেহ জাগলো, তার বাবা কি ঐ চাঁদার টাকা নিতে চাইবে ? গরিব হলেও তার বাবার যে বড্ড অহংকার !

খানিকবাদে একটা রিকশার শব্দ হলো। একি, রিক্সাটা রাস্তার শেষে ঢালু জায়গা দিয়ে নদীতে নামছে কেন ? ওপারে তো রিকশা যায় না।

একটা গাছের আড়াল পড়ে গিয়েছিল, তারপর বিষ্টু চিনতে পারলো এটা তো তাদেরই ভ্যান গাড়ি। তার বাবা আর সাধুকাকা দুপাশে ধরে ধরে নামাচ্ছে। বিষ্টু এবার সেদিকে দৌড়োলো। এরকম দুপুরবেলা ফিরে এলো গাড়িটা। তাও মুদিখানার পেছনে গ্যারেজ করা হলো না, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

ত্রিলোচনের মুখ গনগন করছে রাগে, বাবাজী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে অনবরত। থানার অভিজ্ঞতা তাদের মোটেই সুখকর হয়নি।

থানায় সব সময় অনেক লোকজন। কিছু উটকো, ফালতু লোক সব সময় যে ওখানে কেন ভিড় করে থাকে তা কে জানে ! কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ ভেতরে বসে চা খায়।

রাজেন ঘোষের সমাজপতিত্ব মানতে চায়নি বলেই ত্রিলোচন থানায় যেতে চেয়েছিল। গেটের কাছে পৌঁছে ভীতু সাধুচরণ তাকে পিছু টানে, কিন্তু জেদী ত্রিলোচন জেদ করে ঢুকে এলো। থানা মানেই সরকার। দেশের সরকারের কাছে জানতে চাইবে যে সে কী দোষ করেছে ? কেন লোকেরা তার ভ্যান চরছে না ? কেন রাজেন ঘোষ তাকে হুকুম দিয়ে ডেকে পাঠাবে, সে রাজেন ঘোষের খায় না পরে ?

ছোট থানা, ঢুকেই প্রথম ঘরটায় বসে ছোট দারোগাবাবু, আজ সেখানেই বসে ছিল বড় দারোগা গোপেন সরকার, তার পাশে চায়ের গেলাশ হাতে ভূপেন গড়াই। ত্রিলোচন আর বাবাজী বারান্দায় উঠে আসতেই একজন জমাদার তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আটকেছিল, কিন্তু বড় দারোগা তাদের দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

মাস ছয়েক আগেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল গোপেন সরকারের, হঠাৎ ডায়বিটিস হয়ে শরীরটা চুপসে গেছে। জামা-প্যান্ট ঢলঢল করে, গোঁপটাও যেন ঝুলে পড়েছে। কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি ভালো।

পাশ ফিরে বড় দারোগা ভূপেন গড়াইকে জিজ্ঞেস করলো, এই লোকদুটো ভ্যান চালায় না ?

ভূপেন গড়াই ত্রিলোচন আর বাবাজীকে অনেকদিন ধরে চেনে, এক সময় তার স্টেশনের ধারে সাইকেল সারাইয়ের দোকান ছিল। আজ সে বড় মানুষ হয়েছে, তাই সে ফাঁকা দৃষ্টি দিয়ে বললো, বোধহয় !

বড় দারোগা বললো, কী চাই ?

ত্রিলোচন কোনো উত্তর দেবার আগেই বড় দারোগা গলা চড়িয়ে বললো, তোদের বাড়িতেই সেই রেপ কেস হয়েছে না ? সেদিন ডাক্তারটি এসে বলে গেল। কী করেছিস তাকে নিয়ে ? বাড়িতে পুষে রেখেছিস !

ত্রিলোচন বললো, আজ্ঞে না, লোকে তাকে মারতে···

—মেয়েটা কোথাকার ? ওপার বাংলার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ফরেন ন্যাশনাল। বিনা পাসপোর্টে ঢুকেছে। বর্ডারের চেক পোস্টের লোকগুলো কোনো কাজ করে না, দিব্যি আরাম করে ঘুমোয়। যত ঝামেলা আমাদের। এই, তোরা তাকে দেখা মাত্র থানায় জমা করে দিস নি কেন ?

—আজ্ঞে আমরা তো ঠিক জানি না···

—জানি না মানে ? বিদেশী লোককে বাড়িতে রাখা বেহাইনী তা জানিস না ?

তোরা রিকশা চালাস, মাঝে মাঝে বর্ডার থেকে এইরকম লোক পাচার করিস, তাই না ? কত টাকা করে পাস ? এই মেয়েটা কত দিয়েছে ?

—ভগবানের দিব্যি, স্যার, আমরা লোক পাচার করি না। এই মেয়েছেলেটির কাছে এক পয়সাও ছিল না। দুইদিন খেতে পায়নি বললো···

—তাই তোদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালি ? কটা মুর্গী জবাই করলি ?

ভূপেন গড়াই হেসে উঠলো। বড় দারোগা ভূপেনের প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। তারপর বললো, ডাক্তারটা হুকুম দিয়ে গেল, আমায় গ্রামে গিয়ে ইন্‌সপেকশন করতে। আজকাল সবাই হুকুম দেয়। কে যে কোন পার্টির

www.BanglaBook.org

লোক তা বোঝা মুশকিল। আমার থানায় এই কটা মাত্র স্টাফ, কতদিক দৌড়োদৌড়ি করবো ? ডাকাতির কেস সামলাবো না এইসব বাজে ঝামেলা

ভূপেন গড়াই বললো, মেয়েটাকে থানায় জমা করে দিতে বলুন না !

বড় দারোগা আবার ত্রিলোচনের দিকে চোখ রাঙিয়ে বললো, ফরেন ন্যাশনালকে বাড়িতে আটকে রেখে কত বড় বে-আইনী কাজ করেছিস, জানিস ? তোকেও জেলের ঘানিতে জুতে দিতে পারি...

ত্রিলোচন বললো, আজ্ঞে স্যার...

—কোনো কথা শুনতে চাই না। মেয়েটাকে নিয়ে আয়। আজই মেয়েটাকে এনে থানায় জমা করে দে !

—আজ্ঞে স্যার, সে আর আমার বাড়িতে নাই !

একথা শুনে দারুন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাবাজী ত্রিলোচনের মুখের দিকে তাকালো। ত্রিলোচনের মুখের একটা রেখাও কাঁপেনি, সে স্থির চোখে চেয়ে আছে বড় দারোগার দিকে।

বড় দারোগা ভুরু কুঁচকে বললো, নেই ? তোর বাড়িতে নেই ? তাহলে কোথায় গেল ?

—জানি না স্যার। মেয়েটার মাথায় একটু গোলমাল ছিল, আজ সকালে উইঠে দেখি সে চলে গেছে। আমার ছোটমেয়ের সাথে এক বিছানায় শুতো, সেও কিছু টের পায়নি। সেই কথাই আপনাকে রিপোর্ট করতে এসিছি স্যার।

বড় দারোগা ভূপেন গড়াইকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আবার বর্ডার ক্রস করে ফিরে গিয়ে থাকে, তাহলে আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

ভূপেন গড়াই বললো, হিন্দু মেয়ে, বয়েস কম, ফিরে যাবে কেন ? এইদিকেই কোথায় আছে।

বড় দারোগা একটুক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, যা। খোঁজ খবর নিয়ে দ্যাখ ভালো করে, মেয়েটাকে আবার দেখতে পেলে এখানে জানিয়ে যাবি। ভবিষ্যতে আর কোনো ফরেন ন্যাশনালকে বাড়িতে রাখবি না, এই বলে দিলাম ! আবার যদি কোনোদিন শুনি—

ত্রিলোচন আর বাবাজী নমস্কার ঠুকে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাবাজী হাহাকার করে উঠলো, এ কী বললি, তিলু ?

ত্রিলোচন বললো, ঠিকই বলিছি ! তোর মতন বুদ্ধি নিয়ে চললে এতক্ষণ আমার হাতে দড়ি পড়তো। বলে কি না, আমি বর্ডার থেকে মানুষ চালান দেই !

www.BanglaBook.org

এ যে দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা !

বাবাজী বললো, কিন্তু মেয়েটার তো কোনো দোষ নাই ? সে কিসে কাল সাপ হলো। তুই বলে দিলি, মেয়েটা তোর বাড়িতে নাই, কিন্তু পাড়ার লোক যদি খবর দেয়

ত্রিলোচন বললো, এই দণ্ডেই বাড়িতে ফিরে গিয়ে তারে দূর করে দেবো ! বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ঘর করি, বাড়ির মধ্যে পুলিশ ঢুকবে ? বাপরে বাপ, আমার বুক কাঁপতে ছিল ! বলে কি না বে-আইনী কাজ করিছি।

বাবাজীকে ভ্যানে বসিয়ে ত্রিলোচন সাঁ সাঁ করে চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে। বাবাজী বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, মেয়েটারে তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে ? তার মাথার ঠিক নাই, এবার ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করলি হতো না ?

ত্রিলোচন বললো, পরামর্শ করতে চাস, তুই কর। মোটমাট আমি ওরে আর বাড়িতে রাখবো না। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে। শেষটায় কি ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরবে ?

বাবাজী বললো, মেয়েটারে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে আবার যদি গোষ্ঠবিহারীর পাল্লায় পড়ে ? কুলোকের তো অভাব নাই ! তার চাইতে থানায় জমা দিয়ে যাওয়াই ভালো না ?

ত্রিলোচন বললো, শুনলি না, বললো বেআইনী কাজ ! তুই যদি চোরাই মাল থানায় নিয়ে আসিস, পুলিস তোরে ছাড়বে ? তোর যদি জেলের ঘানি ঘুরাবার শখ থাকে, তাইলে তুই মেয়েটারে নিয়ে থানায় যা !

শীতলা মোড়ে এসে বাবাজীকে জানাতেই হলো যে কালাচাঁদের মুদিখানার পেছনে আর আজ থেকে গাড়ি রাখা যাবে না।

ত্রিলোচন এবারে একেবারে ফেটে পড়লো। সবাই ভেবেছে কী ? সে একটা ফ্যালনা মানুষ ? কালাচাঁদটা এমন বেইমান ? সে মাসে মাসে টাকা নেয়, ত্রিলোচন কি কোনো মাসের টাকা বাকি রেখেছে ? আজ সে কালাচাঁদের টুঁটি চেপে ধরে…

বাবাজী ভ্যান থেকে লাফিয়ে নেমে ত্রিলোচনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বোঝাতে লাগলো, কালাচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। কালাচাঁদ লোক খারাপ নয়, কিন্তু গ্রামের লোক তার ওপর চাপ দিয়েছে। গ্রামের অনেক লোক যে তাদের ওপর বিনা কারণে ক্ষেপে আছে, তা বাবাজী বুঝেছে।

www.BanglaBook.org

ভ্যান গাড়িটা নদীর এপারে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। ছিঁচকে চোরের অভাব নেই। চেন খুলে নেবে, চাকা খুলে নেবে, গোটা গাড়িটাই হাপিস হয়ে যেতে পারে। ত্রিলোচন ঠিক করলো, সে ফেরি নৌকোয় পার করে নিয়ে যাবে তার গাড়ি।

ডিঙি নৌকোটা নেহাৎই ছোট। এত সরু যে তাতে ঐ ভ্যান গাড়ি আঁটে না। তবু ত্রিলোচনের গোঁ, সে ওপারে নেবেই। কিছুদিন যদি ভ্যান চালানো বন্ধ রাখতে হয়, সে মাঠে গিয়ে জন মজুরি খাটবে, তাও সই। তবু সে হার মানবে না।

বিষ্টুকে দেখে সে বললো, তুই ঐ দিকটা ধর। আমি আগে সামনের চাকা তুলে দেই।

বাবাজীর গায়ে শক্তি কম, সে আর বিষ্টু তুলে ধরলো পেছনের চাকা দুটো, ভ্যানটাকে ঠিক মতন বসাবার জন্য ত্রিলোচনকে জলে নেমে পড়তে হলো। তাও পেছনের চাকা দুটো ঝুলে রইলো বাইরে।

আরও দু জন লোক ফেরি পার হতে এসেছে। তারা এবারের খেপে যেতে পারবে না বলে বিরক্ত হয়ে বললো, এই, এসব ভ্যান ম্যান কী উঠাচ্ছিস রে ? আমরা যাবো না ? নৌকোটা ভেঙে যাবে যে !

ত্রিলোচন গরগরিয়ে বললো, খেয়া নৌকোটা তোমাদের বাপের সম্পত্তি নাকি ?

জোড়া শিবমন্দিরের ট্রাস্ট থেকেই খেয়া নৌকোটা দেওয়া হয়েছে বটে, তবু কারুকে কি এমন বাবা তুলে কথা বলতে হয় ? ওই জন্যই তো ত্রিলোচনের ওপর লোকে রেগে যায়।

বিষ্টুকে ভ্যানের ওপর বসিয়ে ত্রিলোচন আর বাবাজী সাঁতরে সাঁতরে নৌকোটা ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো।

এই অবস্থাতেও গান গেয়ে উঠলো বাবাজী

রৌদ্রে পুড়ি বৃষ্টি ভিজি শরীর যেমন মাটি
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা সারা বছর খাটি
আহা শরীর যেমন মাটি

ত্রিলোচন ধমক দিয়ে বললো, এই, গান গাবি না। চুপ মার !

www.BanglaBook.org

বাবাজী হাসতে হাসতে বললো, অত তিরিক্ষি হয়ে আছিস কেন, তিলু ! মেয়েটারে তাড়ায়ে দিতে তোরও মন চায় না, তা আমি বুঝি না ?

ত্রিলোচন বললো, তুই ছাই বুঝিস ! এখনকার এই দুনিয়ায় নিজের ভালোটা বোঝাই আসল কথা।

নৌকোর ওপর থেকে বিষ্টু দারুন অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, ওরে তাড়ায়ে দেবে ?

এবারে কাতরভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে ত্রিলোচন বললো, হ্যাঁরে, বাপ। নইলে আমাদের পুলিসে ধরবে !

বিষ্টুর চোখ মুখ ঘোঁচ হয়ে গেল। পুলিসের ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝলো না। কিন্তু মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, এটা মোটেই তার মনঃপূত নয়।

দক্ষিণ আকাশ জুড়ে মেঘ ছেয়ে এসেছে। রোদ্দুরের রং এখন একটু একটু নীল। সবে মাত্র বাতাসের বেগ বাড়ছে, গাছগুলোর ডগার দিকে পাতারা হাসাহাসি, নাচানাচি করছে এখন।

জ্যামনিও কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। এ বাড়ির দুটি পুরুষ মানুষ একসঙ্গে বাড়িতে ফিরে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে ?

জামরুল গাছের তলায় একটা ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে শ্যামার সঙ্গে সাপ লুডো খেলছে বীণা। একটা সাইকেল ভ্যান টেনে এনে যে এরা বাড়িতে ঢুকলো, সেদিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখে সে খেলায় মন দিল আবার। যেন এ বাড়িতে সে কতকাল আছে, সে এ বাড়িরই অঙ্গ।

রান্নাঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে জ্যামনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ কী হলো তোমাদের ? ওকে তাড়ায়ে দেবার কথা বললে ?

ত্রিলোচন বললো, বেশি কথার কী আছে। ওকে বিদেয় করে দে। তুইই তো বলেছিলি, ওরে বেশিদিন বাড়িতে রাখা যাবে না।

বাবাজী চুপ। বিষ্টু দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। সেও এই আলোচনায় অংশ নিতে চায়।

জ্যামনি বললো, হ্যাঁ, সে কথা বলেছিলাম বটে, তা বলে এত সাত তাড়াতাড়ি কী আছে ! আজ শনিবারের বারবেলা, এমন দিনে মানুষ তার শত্তুরকেও বাড়ি থেকে যেতে বলে না। আজ রাইতটা থাক অন্তত।

ত্রিলোচন বললো, এর মইধ্যে পুলিস আসলে সক্কলের হাতে দড়ি দেবে।

www.BanglaBook.org

তোর বারবেলার আমি ইয়ে...

বাবাজী জ্যামনির সমর্থন আদায় করার জন্য বললো, দ্যাখো না, বৌঠান, আমি বলছিলাম, ডাক্তারবাবুর কাছে যেয়ে একবার পরামর্শ নিতে

জ্যামনি কথা না বলে নীরব সম্মতি জানালো।

ত্রিলোচন বললো, তোরে কে বারণ করেছে। যা না, তুই ওরে ডাক্তারবাবুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফ্যাল। ডাক্তারবাবু আশ্রয় দ্যান তো দেবেন। তারপর পুলিস আর ডাক্তার লড়ালড়ি করুক, তাতে আমার কী ?

বাবাজী বললো, ও মেয়ে এখনো কি হাঁটতে পারবে ? ঐ শরীর নিয়ে এখন ওর হাঁটাহাঁটি করা উচিত না বলেই তো প্রথমদিন ডাক্তারবাবু হাসপাতালে নিলেন না।

ত্রিলোচন বললো, হাঁটতে না পারে, পাল্কী ডেকে আন। তোর যদি বেশি রস থাকে তো ডুলি-পাল্কীতে নিয়ে যা !

জ্যামনি কথা ঘুরিয়ে বললো, মেয়েটা কিন্তু কাজের আছে গো ! আজ সারা রান্নাঘর নিকিয়ে দিল। আমি গুল শুকাতে দিয়েছিলুম, একবার বৃষ্টি আসতেই নিজে থেকে সব তুললো গোয়াল ঘরে।

ত্রিলোচন বললো, বড়লোকের বউ হয়েছিস বুঝি ? বাড়িতে দাস-দাসী লাগবে ?

বিষ্টু বললো, বাবা, পুলিস আসলে তো নদী পেরিয়ে আসবে। আমরা ঠিক ট্যার পেয়ে যাবো। তখন ওরে দাসবাবুদের বাঁশঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে রাখলেই তো হয়।

ত্রিলোচন বললো, পুলিসের সঙ্গে লুকাচুরি চলে না। এখন থেকেই ওসব কথা মনে এস্থান দিও না। আমি যা বলছি শোন, জ্যামনি, দারোগাবাবুরে আমি কথা দিয়ে এসেছি। ওরে শিগগির বিদেয় কর।

জ্যামনি বললো, ওরে হুট করে এমন কথা আমি বলি কী করে ?

ত্রিলোচন বললো, ঠিক আছে, তুই না পারিস, তা হলে আমি গিয়ে বলবো।

জ্যামনি বললো, এমনভাবে বিদেয় করেই যদি দেবে, তাহলে ওকে সাধ করে বাড়িতে এনেছিলে কেন ? বাড়িতে একটা জীবজন্তু থাকলেও মায়া পড়ে যায়।

ত্রিলোচন চলে যেতে উদ্যত হয়ে বললো, তোর মায়া নিয়ে তুই থাক। আমি এখনই ওরে ঘাড় ধরে তাড়াবো !

হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বাবাজী বললো, দাঁড়া। আমি আর একটা কথা

www.BanglaBook.org

বলবো ?

ত্রিলোচন বললো, কী ?

হঠাৎ বাবাজী বাক্যহারা হয়ে গেল। মুখ নিচু করে শরীর মোচড়াতে লাগলো।

ত্রিলোচন তাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললো, কী বলবি, চটপট খোলসা করে বল ! ঝড় আসতেছে !

বাবাজী মাটির দিকে তাকিয়ে বললো, আমি বলছিলাম কী···

—আ মোলো ! ধ্যাষ্টামো করছিস শুধুমুদু। এক্ষুনি বৃষ্টি এসে যাবে।

—বলছিলাম যে, বিদেশী মানুষরে বাড়িতে রাখলে পুলিস রাগ করে। কিন্তু কেউ যদি ওরে বিয়ে করে ফ্যালে, তাইলে তো ও আর বিদেশী থাকে না। এপারে ওপারে এমন বিয়ে তো হয়। হয় না ?

—ওরে বিয়ে করবে ? কে বিয়ে করবে ? ঐ পোকায় খাওয়া ফল···

—যদি ও রাজি হয়, মানে, তুই ভেবে দ্যাখ তিলু, আমার বয়েস মাত্তর পঞ্চাশ কি বায়ান্নো, এখনো তো সব সাধ আহ্লাদ যায় নাই···

—তুই বিয়ে করবি ?

কাছেই যেন বজ্রপতন হয়েছে, এমন ভাবে স্তম্ভিত হয়ে গেল ত্রিলোচন। জ্যামনি আর বিষ্টুর মুখেও কথা সরে না। বাবাজী পায়ের নোখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

সত্যিই গুরুগুরু করে মেঘ ডাকতে শুরু করেছে, বাতাস বইছে শনশন করে, বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে দু' এক ফোঁটা। উঠোন থেকে শ্যামা চেঁচিয়ে ডাকলো, মা ও মা—

ঘোব ভাঙার পর বাবাজীর কাঁধে এক থাবা বসিয়ে ত্রিলোচন হুংকার দিল, কী বললি ?

বাবাজী খুবই আমতা আমতা করে বললো, আমি দু' চারদিন ধরেই আবার দাড়ি কামিয়ে গেরুয়া ছাড়বো ভাবতেছিলাম, মানে, নিজের ভিটেটা তো পড়েই রয়েছে, যদি আবার সংসার পাতি তো খুব কি দোষের হয় ? মানে, ঐ মেয়ে যদি রাজি থাকে···

—পাঁচ জন ওরে নষ্ট করেছে। তুই ওরে বিয়ে করে ঘরের বউ করে নিতে চাস ? তোর মাথা খারাপ হয়েছে ?

—কুকুরে ফুলগাছে পেচ্ছাপ করলে কি ফুল অপবিত্র হয় ? আবার বৃষ্টিতে

www.BanglaBook.org

ধুয়ে গ্যালে সব ঠিক হয়ে যায়। ও তো নিজের দোষে নষ্ট হয় নাই। ওর চক্ষের দিকে তাকায়ে দেখলেই বোঝা যায়, ওর ভিতরে কোনো পাপ নাই, অন্তরটা শুদ্ধই আছে। তুই বুঝে দ্যাখ তিলু, হিন্দু ঘরের মেয়ে, বর্ডার পারায়ে ফেরৎ গেলেও ওর নিজের লোক কি ওরে আর ঘরে নেবে ? দূর দূর ছাই ছাই করবে না ? হিন্দুর মেয়ে একবার ঘরের বার হলে কি আর ফিরৎ যেতে পারে ?

—ওরে ওর আপন লোকে ফিরৎ নেবে না, সেইজন্যই তুই ওরে আশ্রয় দিতে চাস ?

—আমার নিজেরও আবার ঘর বান্‌ধবার সাধ হয়েছে। তুই আর বৌঠান যদি অমত না করে ভরসা দিস···

—ঐ মেয়ের জাতের ঠিক নাই, মাথার ঠিক নাই, কথা বললে ঠিক মতন বোঝে না···

শোকে দুঃখে ওর পাগল পাগল ভাব হয়েছে। একটু মায়া-দয়া পেলে, একটু যত্ন পেলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। তিলু, তুই মনোহর সাঁতরার ছেলে, আমিও তেনার ভাবশিষ্য। একটা অসহায় মেয়েমানুষরে যদি দূর দূর করে আমরা খেদিয়ে দেই, তিনি পরলোকেও কষ্ট পাবেন না, বল ?

ত্রিলোচন এমনভাবে তাকালো বন্ধুর দিকে, যেন সে বলতে চায়, নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক। আমি মেয়েটাকে ঝুঁকি নিয়ে বাড়িতে এনেছি, গ্রামের মানুষের হাতে আর একটু হলে মার খেয়ে মরে যেতাম, আর এখন তুই বেশি বেশি উদারতা দেখাচ্ছিস ! সুন্দর মেয়ে মানুষটিকে দেখে তোর ভোগ-বাসনা জেগেছে !

জ্যামনির দিকে তাকিয়ে সে বিশেষ কোনো আপত্তির ছায়া দেখতে পেল না।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে করে সংসার পাততে চাস, তুই বউরে খাওয়াবি কী ? জমি-জিরেত সব বেচে দিইছিস···

বাবাজী বললো, খুদ-কুঁড়ো যা জোটে ভাগ করে খাবো। আর কিছু না পারি গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করবো !

॥ ৮ ॥

মিনিট দশেক ঝড়ের পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেছে। আরে বাপরে, বৃষ্টির কি তোড় ! রান্নাঘরটা একেবারে ভেঙে পড়বে যেন। অনেকদিন ধরেই ত্রিলোচন ভাবছে, রান্নাঘরখানার খুঁটি বদলে ওপরে নতুন করে ছাউনি দিতেই হবে। কিন্তু

www.BanglaBook.org

এখনও মাঠে ধান ওঠেনি, খড় পাওয়া যাবে কোথায় ! রান্নাঘরটা এই বর্ষায় শেষ পর্যন্ত টিঁকলে হয় !

রান্নাঘরের দাওয়াতেই খেতে বসে গেছে ত্রিলোচন, বাবাজী আর বিষ্টু। গোয়াল ঘরের ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে বীণা আর শ্যামা। উঠোনে বৃষ্টির যেন খই ফুটছে। চতুর্দিকে ঝিঁঝির ডাকের মতন শব্দ।

খিচুড়ি, কলমী শাক আর বেগুন সেদ্ধ। সেদ্ধর বদলে দু' খানা করে বেগুন ভাজা হলে আরও ভালো স্বাদ পাওয়া যেত। জ্যামনি শ্যামাকে একবার পাঠিয়েছিল শর্ষের তেল আনতে, কিন্তু কালাচাঁদ আর ধারে জিনিস দেবে না বলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

খিচুড়িতে বেশ তার হয়েছে, ত্রিলোচন বললো, দেখি, আর দুই হাতা। আর সবার জন্য আছে তো ? বিষ্টু নিবি নাকি ?

বাবাজী হাত গুটিয়ে নিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ চোখে জল এসে যাচ্ছে তার। জীবনের কত বড় একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেললো, আবার সে সংসার পাতবে, একজন জীবন্ত মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে। বুকটা কাঁপছে অনবরত।

মাঝে মাঝে সে চোরা চোখে দেখছে গোয়াল ঘরের দিকে। বৃষ্টির জল যেন একটা পাতলা পর্দার মতন, তার ওপাশে যে নারীকে দেখা যায়, সে যেন পুরোপুরি রক্তমাংসের নয়, সেই যেন জোছ্ছনাকুমারী। লাল পাড় শাড়ীতে তাকে এখন বেশ ফর্সা দেখাচ্ছে। বাবাজী ওকে নিয়ে আবার গান বাঁধবে। পুকুরের জলে বুড়বুড়ি কাটার মতন তার মনের মধ্যেও ঘুরে ফিরে আসছে একটা আধটা গানের কথা :

বটবৃক্ষের তলে একদিন ফুটিল জ্যোছ্ছনা
রাত্তির নয়, আন্ধার নয়, দিনেরো মুছ্ছনা
আহা ফুটিল জ্যোছ্ছনা…
কালো কেশে বিজলি খেলে চক্ষে ঝরে পানি
কার ঘরণী কার বা কন্যা কিছুই না জানি
আহা চক্ষে ঝরে পানি…

এই কন্যা এবার বাবাজীর ঘরণী হবে। বাবাজী তার চক্ষের জল মুছিয়ে দেবে। স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রাখবে তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু' হাতার জায়গায় চার হাতা খিচুড়ি নিয়েছে ত্রিলোচন। বেগুন সেদ্ধ তার মুখে রোচে না, কচি কচি বেগুন, ভেতরটা শক্ত। কিন্তু কলমী শাক তার খুব পছন্দ। শেষ পাতে থালা চাটতে চাটতে ত্রিলোচন গম্ভীর ভাবে জ্যামনিকে জিজ্ঞেস করলো, ও মেয়ের বাড়ি ঘরের কথা বলেছে কিছু ?

জ্যামনি বললো, আমি কিছু জিজ্ঞাস করতে গ্যালেই চুপ করে থাকে। কিন্তু শামার সাথে অনেক কথা কয়।

ত্রিলোচন বললো, তাইলে শামারে দিয়েই জিজ্ঞাসা করা। ওপার বাংলায় ওর বাড়ি ঘরে কে কে আছে, বিয়ে হয়েছে কি না, সে সব জানতে হবে না ? ঐ দিকে একটা খবরও যদি দেওন যেত···

দুই ধারে একই মাটি মইধ্যে খড়ির দাগ
মানুষগুলান একই রে, ভাই, তবু হইলো ভাগ
আহা মইধ্যে খড়ির দাগ।

জ্যামনি বললো, একবার যখন চলে এসেছে, তখন খবর দেওয়া-না-দেওয়া একই কথা। ঐ সব চিন্তা ছাড়ান দাও ! বিয়ের ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি করা যায়

এতক্ষণ বাদে ত্রিলোচন সামান্য হেসে বাবাজীকে বললো, দাড়িটা কামায়ে ফ্যালা। তারপর দ্যাখ তোরে পছন্দ করে কি না !

বিষ্টুও খুক খুক করে হেসে ফেললো। সাধুকাকা বিয়ে করতে চেয়ে একটা মহা বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ফেলেছে বলে তার মনে হয়।

বিয়ে তো আর এমনি এমনি হয় না, পাঁচ জন লোক ডেকে সাক্ষী রাখতে হবে, পুরুত আনতে হবে। এর মধ্যে এত বৃষ্টি এসেই ব্যাগড়া বাঁধালো। বৃষ্টি একটু ধরলেই বিষ্টু যাবে ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরীকে খবর দিতে। পাশের গ্রামে একজন ভালো মানুষ পুরুত থাকে, বাবাজীর আগের বিয়ে সেই দিয়েছিল, তাকে ঠিক আনা যাবে। একখানা অন্তত নতুন শাড়ী না হলে কি বিয়ে হয় ? সেজন্য আবার ছুটতে হবে বাজারে।

বাবাজীর কাছে যে জমা তিনশো পঁচিশ টাকা আছে, সে কথা সে ফাঁস করেছে একটু আগে।

এটা দোষের কিছু নয়। পরের বাড়িতে থাকে বলেই যে সব টাকা খরচ করে ফেলতে হবে তার কি মানে আছে ? হঠাৎ বিপদ-আপদের জন্য তো কিছু সরিয়ে রাখা ভালোই। ত্রিলোচন তা পারে না। ভালোই হলো, আজকের জন্য হাত

www.BanglaBook.org

পাততে হবে না কারুর কাছে।

কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা এ বাড়িতে হবে না, বাবাজীর ভিটেতেই করতে হবে। বড় দারোগাকে ত্রিলোচন বলে এসেছে যে জয় বাংলার সেই মেয়ে তার বাড়িতে নেই। এই বিয়ের কথা পুলিসের কানে যাবেই। মিথ্যের ভাগী হলে ত্রিলোচনকে পরে সেজন্য গুঁতো খেতে হতে পারে। এইসব কথাও বিবেচনা করতে হবে তো!

বাবাজীর ঘরখানা সাফ-সুতরো করতে হবে বটে, কিন্তু সেই ভিটেয় বিয়ে দেওয়ার একটা সুবিধেও আছে। সে পাড়ায় আরও দশ বারো ঘর গোয়ালা আছে, তারা বাবাজীর জ্ঞাতি, কোনো গণ্ডগোল হলে বিপদের সময় তারা বাবাজীর পাশে এসে অবশ্যই দাঁড়াবে। গোয়ালাদের লাঠির জোরকে অনেকেই ভয় পায়।

সামনে অনেক কাজ, এখন বৃষ্টি একটু ধরলেই হয়।

আঁচিয়ে ওঠার পর বাবাজী সত্যি সত্যি দাড়ি কামাতে বসে গেল। নিজের ক্ষুরটা সে ত্রিলোচনকে দিয়ে দিয়েছিল, আজ আবার ধার নিতে হলো সেটা। বিষ্টু তার পাশে উবু হয়ে বসে আছে। দাড়ি গোঁপ ছাড়া বাবাজীর মুখখানা কেমন, তা যেন সে ভুলেই গেছে।

এক সময়ে চকচকে মুখখানা বেরিয়ে পড়তেই বিষ্টু হাততালি দিয়ে উঠলো।

ছোট্ট আয়নাখানা তুলে বাবাজী নিজেও মুগ্ধ ভাবে দেখছে নিজের বদনখানা। যেন সে একটি অন্য মানুষকে দেখছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে জ্যামনিও ফিক করে হেসে ফেললো।

লুঙ্গিখানা ছাড়িয়ে একটু আগেই বাবাজীকে একখানা ধুতি পরিয়েছে জ্যামনি। বিয়ের দিনে গেরুয়া পরে যায় কোনো মানুষ? দেখলেই কেমন যেন লাগে!

বাড়িতে কলাই করা থালা মোটে তিনখানা। পুরুষরা খেয়ে গেলে সেই থালা ধুয়ে মেয়েরা খাবে। শ্যামাকে থালা মাজতে বলা হয়েছিল, বীণাও সেই সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। বৃষ্টির জলেই তারা থালা ধুয়ে নিল। বীণা ইচ্ছে করে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে খিলখিল করে হেসে উঠছে এক একবার। সে বিয়ের কথা এখনো জানে না।

বৃষ্টির ঝাপটা একটু কমলে টোকা মাথায় দিয়ে বিষ্টু বেরিয়ে গেল ডাক্তারকে খবরটা জানাতে। বিষ্টু মনে মনে ঠিক করেছে, কায়স্থপাড়ার গোপাদিকেও সে খবরটা বলে যাবে।

www.BanglaBook.org

বাজারে ত্রিলোচনই যাবে ঠিক হয়েছে। শাড়ী কেনা ছাড়াও কিছু চাল-ডাল, এক হাঁড়ি অন্তত দই, আরও কিছু টুকটাক জিনিস কেনা দরকার। অন্তত দশ বারো জন লোকতো খাবেই, একটু হৈ চৈ না হলে ঠিক বিয়ে-বিয়ে মনে হয় না।

সে জন্য সাইকেল ভ্যানটা নিতে হবে, আবার সেটাকে খেয়ায় পার করাতে হবে। তাতে অবশ্য ত্রিলোচন বিরক্ত বোধ করছে না, বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যাবার পর তার মনটাও একটু ফুরফুরে লাগছে। বিয়ে বলে কথা!

যে-মেয়েকে অন্তত দু জন পরপুরুষ অত্যাচার করেছে, সবাই জেনে গেছে সে কথা, সেই মেয়েকে এককথায় বিয়ে করতে রাজি হওয়া, তাকে বউ হিসেবে ঘরে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে যে দারুণ একটা সাহসের ব্যাপার আছে, তা ত্রিলোচনকে স্বীকার করতেই হয়। এরকম কাণ্ড এ তল্লাটে কখনো ঘটেনি। সনাতন চাষার বউকে একরাত্তিরে কয়েকজন মাঠের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর সনাতন তো সে বউকে আর ঘরেই নিল না। বউটার কি কোনো দোষ ছিল? সে বউটা কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যেন চলে গেল!

খোঁড়া। ভীতু প্রকৃতির বাবাজী যে এরকম একটা সাহসের কাজ করতে যাচ্ছে, এজন্য ত্রিলোচন মনে মনে খুশীই হয়েছে। সংসারে একটা প্রাণীকে বাঁচানোও কম কথা নয়।

বৃষ্টিটা আর একটু কমলেই ত্রিলোচন আর বাবাজী ধরাধরি করে সাইকেল ভ্যানটা নদী পার করাবে। তারপর ত্রিলোচন যাবে বাজার সারতে, পুরুতকে রাজি করাবার ভার বাবাজীর। নিজের পাড়ায় গোয়ালাদেরও সেই নেমন্তন্ন করে আসবে। তার আগে বড় ঘরের দাওয়ায় বসে দুই বন্ধু একটু বিড়ি টেনে নিচ্ছে।

রান্নাঘরের বারান্দায় খিচুড়ির হাড়িটা মাঝখানে বসিয়ে জ্যামনি খেতে বসে গেছে শ্যামা আর বীণাকে নিয়ে। বিষ্টু তার বাপ-কাকার সঙ্গে বাড়ি চলে এলেও মেজো ছেলেটা এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি। এত বৃষ্টিতে সে আসবেই বা কী করে?

মেজো ছেলের জন্য হাঁড়িতে কিছুটা রেখে দিয়ে বাকি খিচুড়ি সে ভাগ করে দিল তিন থালায়। একটু একটু কলমী শাক, একটু একটু বেগুন সেদ্ধ।

এইসব সামান্য খাবারই বীণা খুব মন দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খায়। যেন সে কোনোদিন ভালো করে খেতে পায়নি, অথচ তার চেহারা দেখলে তা মনে হয় না। তেমন রোগা সে নয়। এই ক'দিন গায়ের বিভিন্ন জায়গার ঘাগুলি অনেকটা সেরেছে।

www.BanglaBook.org

একটুক্ষণ খাওয়ার পর জ্যামনি হাতে নিজের খিচুড়ির গেরাস নিয়ে অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলো বীণার দিকে। মুখের দু' পাশ দিয়ে চুল ঝুলে পড়েছে, ভারি কোমল দৃষ্টি, তবু কিছু যেন একটা অলৌকিক ব্যাপার আছে এই মেয়েটার মধ্যে। মাত্র কয়েকদিন আগেই সে যে মরতে মরতে বেঁচে গেছে, সে কথা একবারও উচ্চারণ করে না। পিছনের কথা কিছুই বলে না। সাধারণ গেরস্ত ঘরের মেয়ে কি এরকম হয় ? না হয় ধরেই নেওয়া গেল, ওর মাথার একটু গোলমাল হয়ে গেছে, কিন্তু শ্যামার সঙ্গে খেলা করে, খায় দায়, সে সব তো সব ঠিকঠাক।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে রাগ হয় না, মায়া মায়া ভাব হয়।

জ্যামনি বললো, ও শামা, ওরে বল, আজ ওর বিয়ে হবে !

শ্যামা বললো, কার সাথে বিয়ে হবে, মা ?

জ্যামনি বললো, তোর সাধুকাকার সাথে। ওরে জিজ্ঞাস কর, সাধুকাকাকে ওর পছন্দ তো ? সাধুকাকা লোক ভালো, ওরে যত্নআত্যি করবে !

শ্যামার মতন ঐটুকু মেয়েও বিয়ের ব্যাপারটা বোঝে। সে চোখে মুখে হেসে তার এই নতুন খেলার সাথীকে বললো, এই, তোমার আজ বিয়ে হবে ! কী মজা !

বীণা গাঢ় চোখ মেলে শ্যামার দিকে তাকিয়ে বললো, কার শাদী হবে ?

শ্যামা ওর বাহুতে একটা খোঁচা মেরে বললো, তোমার !

হি হি হি হি করে হেসে উঠলো বীণা। বিয়ের কথায় কোন মেয়ের না অন্যরকম ভাব হয় ! সেও ঠিক শ্যামার মতই শ্যামার বাহুতে একটা খোঁচা মেরে কৌতুক করে বললো, তোর শাদী হবে ! তোর !

শ্যামা বললো, আমার নয়, তোমার !

বীণা বললো, না, না তোর। তোর শাদী হবে, আমরা দাওয়াত খামু !

শ্যামা নালিশ করে বললো, মা, দ্যাখো না। ও বলছে আমার বিয়ে হবে ! আমি সাধুকাকাকে মোটেই বিয়ে করবো না। ও বিয়ে করবে। আমি বিয়ে করবো বাবাকে। বাবা অনেক ভালো !

বীণা যেহেতু জ্যামনির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না, তাই এবারেও জ্যামনি মেয়েটির উদ্দেশে কিছু না বলে শ্যামাকেই বললো, তুই ওকে বল, তোর বিয়ে পরে হবে। আজ ওর বিয়ে সাধুকাকার সাথে। আমরা একটু পরেই সাধুকাকার বাড়ি যাবো। ও নতুন শাড়ী পরবে, লোকজন আসবে, ধূমধাম হবে।

www.BanglaBook.org

বীণা এবার মুখ ঘুরিয়ে জ্যামনির দিকে তাকালো। অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে চোখে স্থির দৃষ্টি দিয়ে ধমকের সুরে বললো, আমার শাদী হয়ে গেছে। আমি আর বিয়ে করবো না! নিকে করবো না!

কলাই করা থালাটা জোরে ঠেলে দিয়ে সে বললো, আমি আর খাবো না! আমি বাড়ি যাবো!

হতভম্বের মতন জ্যামনি বললো, নিকে? তুমি কী বলছো গো? তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে না?

বীণা সরাসরি জ্যামনির চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললো, আমার নাম ফতিমা। আমার খসমের নাম জয়নাল আলি। সে মরে গেছে, আমার একটা পোলা ছিল, সেও মরে গেছে!

জ্যামনি ডুকরে উঠে বললো, এ কি সব্বোনেশে কথা গো? তুমি না বলেছিলে তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে? তোমার নাম বীণা?

মেয়েটি কটমট করে চেয়ে থেকে বললো, কে বলেছে তোমারে সে কথা? আমি বলিছি? এটা ইন্ডিয়া, না বাংলাদ্যাশ? এটা কোন্ দ্যাশ? আগে কও, এটা কোন্ দ্যাশ? অ্যাঁ?

—তুমি মোছলমান?

—কে বলেছে তোমারে যে আমি হিন্দু?

ত্রিলোচন আর বাবাজী তখন সবেমাত্র সাইকেল ভ্যান বার করে রওনা দিয়েছে। জ্যামনি ভূত দেখার মতন চেঁচিয়ে মেচিয়ে একেবারে একশা করে তুললো।

—ও শ্যামার বাপ! ও ঠাকুর পো! শিগগির এসো! শিগগির ইদিকে এসো! ভয়ংকর কাণ্ড হয়েছে গো!

বাচ্চা মেয়ে শ্যামা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে। সে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে সিঁটিয়ে বসেছে।

চিৎকার শুনে দৌড়ে ফিরে এলো ত্রিলোচন আর বাবাজী।

জ্যামনির মতন ঠাণ্ডা মাথার সংসারী নারীকে এমন উথাল পাথাল করতে কখনো দেখেনি ত্রিলোচন। এঁটো হাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে সে প্রায় তিড়িং বিড়িং করে ছটফটিয়ে বলতে লাগলো, কী সাংঘাতিক কথা গো! তোমরা ওর বিয়ে দিতে যাচ্ছিলে? ও মোছলমানের ঘরের বউ! এবার হাতে দড়ি পড়বে, আমাদের সক্কলের হাতে দড়ি পড়বে!

www.BanglaBook.org

ত্রিলোচন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, এবার কি তোর মাথা খারাপ হলো নাকি ? শুধুমুদু চিল্লামিল্লি করছিস ! ওর নাম বীণা, ওর বাপের নামও বলেছিল, সে হিন্দু।

শ্যামা বললো, বাবা, ও বীণা নয়, ও ফতিমা ! এই মাত্তর বললো !

ত্রিলোচন এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই, তোমার নাম কী, ঠিক করে বলো !

সেই মেয়ে ত্রিলোচনের দিকে সোজা তাকিয়ে পরিষ্কার উচ্চারণে বললো, আমার নাম ফতিমা। আমার খসমের নাম জয়নাল আলী, তার ইন্তেকাল হয়েছে গত বৎসর।

—তবে যে তুমি আগে বলেছিলে···

—এইটা কোন্ দ্যাশ ? বাংলাদ্যাশ না ইন্ডিয়া ? এটা কাগো বাড়ি ?

ত্রিলোচন বিহ্বল চোখে জ্যামনি ও বাবাজীর দিকে তাকালো।

বাবাজীও ঘাবড়ে গেছে, তার মুখখানা ছায়া মাখা, তবু সে আস্তে আস্তে বললো, মোছলমান হলেও আমার বিয়ে করতে আপত্তি নাই !

রাগের চোটে ত্রিলোচন প্রচণ্ড জোরে একখানা চড় কষালো বাবাজীর ঘাড়ে।

ওপার বাংলার এক বিবাহিতা মুসলমান স্ত্রীলোককে সে বাড়িতে আটকে রেখেছে, এটা শুধু বেআইনী নয়, বেআইনীর বাবা ! পুলিসে টের পেলে নির্ঘাৎ গারদে দেবে !

এই পাগল মেয়েটা আর একবেলা চুপ করে থাকলে বাবাজীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল ! এই বাবাজীটাও কি বিয়ে পাগলা হয়ে গেল, মুসলমান শুনেও বলে কি না রাজি ! জেলে যাবার জন্য পাখা গজিয়েছে !

জ্যামনি বললো, শিগগির ওরে সরাও ! আর কেউ যেন টের না পায় !

চড় খেয়ে বাবাজী দু' হাতে মাথা চেপে বসে পড়েছে। সেই চড়ে তার মাথাও পরিষ্কার হয়েছে। সে বুঝেছে যে, আর কিছুতেই সম্ভব নয়। ওপার বাংলার মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করা সত্যিই অসাধ্য ব্যাপার। এ মেয়ে যদি জোছ্ছনাকুমারী হয়, তবে কিছুতেই সে ধরা দেবে না। শুধু দু'দিনের জন্য ছলনা করতে এসেছিল।

বীণা কিংবা ফতিমা যাই হোক, সেই মেয়ে যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে শ্যামাকে বললো, চল রে, আমরা আবার লুডো খেলি !

শ্যামা বললো, না, আমি আর খেলবো না।

www.BanglaBook.org

ত্রিলোচন গর্জন করে বললো, এই, নেমে এসো ! নীচে নেমে এসো !

দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সেই মেয়ে বললো, না, আমাকে ধরতে পারবা না। আমার গায়ে হাত দেবা না !

জ্যামনি দৌড়ে দাওয়ায় উঠে তার হাত চেপে ধরে বললো, যাও, নিজের বাড়ি যাও। এখানে থাকতে পারবে না।

সেই মেয়ে নিজেই জ্যামনিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো ভাবে বললো, আমি যাবো না ! আমারে অগো হাতে দিও না ! আমারে মারবে। তোমার পায়ে পড়ি।

জ্যামনিও কেঁদে ফেলে বললো, ওরে, তুই নিজের বাড়ি যা ! আমাদের কেন বিপদে ফেলবি ! এ বাড়ির পুরুষ মানুষরে পুলিসে ধরে নিয়ে গ্যালে আমরা যে না খেয়ে মরবো !

তারপর শুরু হলো ঠ্যালাঠেলি। সে মেয়ে কিছুতেই দাওয়া থেকে নামবে না, জ্যামনি তাকে নামাবেই। মাকে সাহায্য করতে শ্যামাও হাত লাগালো।

দু' জনের ধাক্কায় এক সময় সেই মেয়ে উঠোনে এসে পড়লো। জল কাদায় মাখামাখি হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগলো, আমি যাবো না ! আমার ভয় করে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি।

জ্যামনিও হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে, যা, যা, আমার বাড়ি থেকে চলে যা, আমার ছেলেমেয়েদের বাঁচা তুই।

ত্রিলোচন একখানা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেললো সেই মেয়ের দু' হাত। মেয়েছেলের গায়ে হাত না দিয়ে এইভাবে টানা সুবিধের।

বাড়ির গোরুকে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে সে যেমন টের পেয়ে গিয়ে যেতে চায় না, জোরাজুরি করে, সেইরকম এই মেয়েটিও সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছনে বেঁকে রইলো, পাগলাটে গলায় বলতে লাগলো, আমি যাবো না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না।

গামছা ধরে সামনে টানতে লাগলো ত্রিলোচন, জ্যামনি আর শ্যামা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো। রান্নাঘরের পেছনে সাইকেল ভ্যানের ওপর ফেলে দেওয়া হলো তাকে।

বাবাজীও উঠে এসেছে।

ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশেষিত মানুষের মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জিজ্ঞেস করলো, একবার সত্যি করে বলো তো, তোমার নাম বীণা না ফতিমা ?

বাবাজীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সে মেয়ে বললো, আমারে তোমরা

www.BanglaBook.org

মারবা ? আরব দ্যাশে বিক্রি কইরা দেবা ?

বাবাজী এ কথার অর্থ বুঝলো না। সে ত্রিলোচনকে বললো, চল তিলু, ওরে বর্ডারে ক্যাপটেন সাহেবের কাছে দিয়ে আসি। তিনি যা ভালো বোঝেন করবেন।

সীটের ওপর উঠে বসে ত্রিলোচন বললো, তুই ওরে চেপে ধরে থাক। হঠাৎ লাফ দিয়ে না পালায়।

বাবাজী অরাজি ভাবে বললো, আমি ওরে ধরবো ? সেটা কি ঠিক হবে ?

জ্যামনি বললো, না, সেটা ঠিক হবে না। গ্রামের লোক দেখে কী ভাববে ! আমি ওরে ধরে রাখছি। তুমি সাথে সাথে হাঁটো। অ শামা, তুই বাড়িতে থাক।

জ্যামনি উঠে বসলো ভ্যানে। শাড়ীর আঁচলে মেয়েটির বাঁধা হাত ঢেকে দিয়ে, পিঠ বেড়িয়ে চেপে ধরলো তাকে। মেয়েটি এখন আর আপত্তি করছে না।

বৃষ্টি একেবারে থামেনি, ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। রাস্তায় মানুষজন কম। আকাশ এখনো কালো হয়ে আছে। আজ আর বিকেলের আলো ফুটবে না।

এই সময়ে খেয়াঘাটেও ঝগড়া বাঁধাবার কেউ নেই। জ্যামনি আর মেয়েটি সমেতই সাইকেল ভ্যানটি চাপানো হলো নৌকোয়। বাবাজী আর ত্রিলোচন নেমে পড়লো জলে।

বৃষ্টির জন্য কালাচাঁদের মুদিখানার সামনের দোকানের বেঞ্চেও আড্ডা বসেনি।

কালাচাঁদের বদলে দোকানে বসে আছে লক্ষ্মী। জ্যামনি যেন বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে এই ভঙ্গিতে উৎসুকভাবে চেয়ে রইলো সামনের দিকে। যদিও তার কোনো বাপের বাড়িই নেই।

গড়বন্দীপুর গ্রামের সীমানা তারা ভালোয় ভালোয় পার হয়ে এলো। এবার একটু এগোলেই বড় রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে ডান দিকে সোজা চলে গেলে চেক পোস্ট। এদিকে দু' পাশে শুধু চাষের জমি, আর কিছু অনাবাদী জলাভূমি, জনবসতি বিশেষ নেই।

জ্যামনি বললো, আমি এবার যাই ? বাড়িতে সব খোলা রেখে এসেছি।

ত্রিলোচন সাইকেল থামালো। তার মাথাতেও একটা অন্য চিন্তা এসেছে।

জ্যামনি নেমে পড়তেই সেই মেয়ে বলে উঠলো, ও দিদি, কোথায় যাও ?

www.BanglaBook.org

আমারে কোথায় নিয়ে যায় ? আমার ভয় করে !

ত্রিলোচন তড়পে উঠে বললো, চোপ ! চ্যাঁচালে থাপ্পড় মেরে সব কটা দাঁত খুলে ফেলে দেবো ? একদম চুপ করে বসে থাক !

জ্যামনি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, আহা, অত ধমকাও কেন ! শোনো বাছা, তোমার কোনো ভয় নাই। তোমারে এনারা ভালো জায়গায় দিয়ে আসতেছেন। তুমি নিজের বাড়ি চলে যাবে।

সে মেয়ে তবু বললো, ও দিদি, আমার ভয় করে। আমার কেউ নাই !

জ্যামনি তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, ভয় পেও না, নিজের বাড়িতে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা গরিব, পুলিসে ধরলে শেষ হয়ে যাবো !

ত্রিলোচনও নেমে দাঁড়িয়ে বললো, পেনু, এবার তুই চালা ! তুই ওরে নিয়ে যা বর্ডারে।

বাবাজী চমকে গিয়ে বললো, আমি একা যাবো ? তুই যাবি না ?

ত্রিলোচন কঠোর ভাবে বললো, একটা ভ্যান চালাতে দুইজন লাগে কিসে ?

—ওকে কে ধরে থাকবে ?

—আর কেউ ধরবে না।

—যদি নেমে পালাতে চেষ্টা করে ?

—পালাতে চায় পালাবে ! আমাদের বিড়াল পার করা নিয়ে কথা। এখন ও জয়বাংলায় যাবে না এইদিকে থাকবে, তা ও নিজে বুঝুক। আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নাই !

বাবাজী তবু অসহায় ভাবে বললো, তিলু, তুই সাথে চল, না হলে আমি ভরসা পাবো না।

ত্রিলোচন চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, বিয়ে করার যে খুব শখ হয়েছিল। তখন আমারে সাথে নিতিস ? যা, যা, দেরি করিস না।

বাবাজী জানে, ত্রিলোচন একবার যখন না বলেছে, আর ওর মত ফেরানো যাবে না।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে সাইকেলে উঠে বসলো, প্যাডেল চালালো। ত্রিলোচন তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে নিয়ে নিল নিজের গামছাখানা।

তারপর ত্রিলোচন চোখ গরম করে স্ত্রীলোকটিকে বললো, ওপারে যেতে ইচ্ছা না হয়, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও ! আমাদের বাড়ির দিকে আর পা বাড়ালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠ্যাং ভেঙে দেবো ! গোষ্ঠবিহারীর হাতে তুলে দেবো !

জ্যামনি বললো, চোপ ! এই রাক্ষুসী আর একটু হলে আমার ছেলে মেয়েরে খেত ! পাশের গাঁয়ের মোছলমানরা জানতে পারলে আমার সর্বনাশ করে দিত !

হঠাৎ রেলের ইঞ্জিনের মতন একটা তীক্ষ্ণ শব্দ উঠে এলো মেয়েটির বুক থেকে। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললো, বিড়াল ! আমারে বিড়াল কইলো !

ত্রিলোচন রূঢ় ভাবে তার ঘাড় ধরে চেপে আবার বসিয়ে দিয়ে বললো, এখানে নামতে পারবি না, চুপ করে বসে থাক !

জ্যামনি স্বামীকে টেনে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বাবাজী ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে, ত্রিলোচন তাকেও ধমক দিয়ে বললো, এই শালা, তুই মাগভেড়ুয়ার মতন বসে রইলি যে ! এগো, এগিয়ে পড় !

স্ত্রীলোকটির চোখে জল নেই। সে জ্যামনির দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, তুমি আমারে চেনো না ! তুমি আমার কেউ না !

জ্যামনি বললো, আমরা সংসারে কেউ কারুকে চিনি না। কেউ কারুর না। সবাই নিজের ধান্দায় কোনোরকমে বেঁচে থাকা।

স্ত্রীলোকটি একইরকম সুরে বললো, এইটা কোন্ দ্যাশ, তাও আমি চিনি না !

জ্যামনি ওর থুতনি ছুঁয়ে ধরা গলায় বললো, যাও বাছা, সুখে থাকো !

এগিয়ে গেল সাইকেল ভ্যানটা। এরা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখলো একটুক্ষণ। তারপর ভ্যানটা একটা বাঁক ঘুরে চলে গেল চোখের আড়ালে।

যে নারীকে বাবাজী আজ সন্ধেবেলা মন্ত্র পড়া বউ হিসেবে নিজের বুকে স্থান দিতে চেয়েছিল, এখন তাকেই সে নিজের হাতে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে।

লখীন্দরকে কোলে লয়ে গো গেস্‌লো বেউলো সতী
আর পুরুষে দেয় নারীর বলি এ কেমন নিয়তি
আহা গেস্‌লো বেউলো সতী
দময়ন্তী যম দুয়োরে বাঁচালেন নল রাজায়
পুরুষ মানুষ বউরে পোড়ায় চামড়ায় ডুগডুগি বাজায়
আহা বাঁচালেন নল রাজায়
মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে কান্দে বাপ আর মা
মেয়ে জাতি না থাকিলে কেহই জন্মাইতো না

www.BanglaBook.org

আহা কান্দে বাপ আর মা
অসহায় এক যোবতীরে কুকুর বিল্লির লাহান
কোথায় নিল পার করিতে শ্মশান গোরোস্থান
আহা কুকুর বিল্লির লাহান

বাবাজীর বুকের মধ্যে উথাল পাতাল করছে, চোখের কোণে নোনা জল। শেষ পর্যন্ত জ্যোছ্ছনাকুমারী মুসলমান হলো? হোক না মুসলমান, আউল-বাউলদের মধ্যে কত আকছার হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হয়। এ মেয়ের স্বামী মারা গেছে, তাহলে আর বাধা কিসের?

তবু বাধা আছে। ত্রিলোচন-জ্যামনি কোনো সম্পর্ক রাখবে না আর। নিজের ভিটেয় থাকতে গেলেও কি তার গোয়ালা জ্ঞাতিরা এই বিয়ে মানবে? কদমতলি গ্রামে জিতেন-মালেকাকে নিয়ে কী কাণ্ডই হয়ে গেল, তবু তারা পয়সাওয়ালা লোক, পয়সার জোর দিয়ে অনেক কিছু সামলানো যায়।

পুলিস কি মানবে। সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। এদিক থেকে মুসলমানেরা জয়বাংলায় চলে যায়, আর ফিরে আসে না, মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে। আর ওদিক থেকে হিন্দু চলে এলে এদেশের পুলিস অনেকটা চক্ষু বুজে থাকে। এর উল্টোটা চলে না।

মেয়েটার মাথার ঠিক নেই, আজ যে বললো ও মুসলমান, সেটা ঠিক বলেছে তো? পাগলের মুখ থেকে কত রকম বিলকি ছিলকি কথা বেরোয়। যদি ভুল হয়? একবার ও মেয়েকে চেক পোস্টে পৌঁছে দিলে আর সে ভুল শোধরানো যাবে না। ওঃ, তাহলে বাবাজী বাকিজীবন কী করবে?

আর একবার যাচাই করবার জন্য বাবাজী প্যাডেল করা থামিয়ে পেছন ফিরে তাকালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভ্যানের ঠিক মাঝখানে হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে পাষাণ মূর্তির মতন বসে আছে সেই মেয়ে।

বাবাজী কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, ও বীণা, একটা কথা ভালো করে শুনবে?

কোনো উত্তর নেই।

বাবাজী আবার বললো, তুমি সত্যিই ফতিমা? না বীণা? আর একবার মুখ ফুটে বলো!

কোনো উত্তর নেই।

বাবাজী একটু ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুল ভাবে বললো, তুমি ফিরা যেতে চাও, না

www.BanglaBook.org

এখানে থাকতে চাও ?

এবারে মৃদু হেঁচকি তোলা কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবাজী তার অর্থ কী বুঝবে ?

বর্ডারের এদিকে মহাবীর নামে এক হাবিলদার এই মেয়েকে কামড়ে-ছিঁড়ে খেয়েছে। বর্ডারের ওপারের হাবিলদাররাও তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়। ওদিকেও একজন এই মেয়েকে চুষে-চিবিয়ে খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এসব জেনেশুনেও বাবাজী আবার একে ঐ ভয়ানক স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসবে ?

বুকটা মোচড়াচ্ছে, দারুণ ভাবে মোচড়াচ্ছে।

বাবাজীর হঠাৎ ইচ্ছে হলো সাইকেল ভ্যানটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে খুব জোরে চালিয়ে দিতে। স্টেশন-বাজার ছাড়িয়ে, শক্তিনগর-কেষ্টনগর ছাড়িয়ে যদি আরও অনেক দূরে, বহু দূরে, নিরুদ্দেশে চলে যাওয়া যায় এই মেয়েকে নিয়ে ? কেউ যেখানে তাদের চিনবে না। এক অচেনা নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর বেঁধে নতুন করে সংসার পাতা হবে···

রাস্তার পাশ থেকে যমদূতের মতন উঠে এলো তিনটি ছোকরা। একজন সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরে বললো, এই কোথায় যাচ্ছিস ?

আর একজন বললো, আরে, এ ব্যাটা দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ভেক পাল্টেছে।

—তোর কেষ্টদার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল না ? টাকা অ্যাডভান্স নিইছিস !

—সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ, একে নিয়ে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি ?

ওদের দেখে বাবাজী থ মেরে গেছে। মুখে কথা সরছে না। ওদের একজন মেয়েটির চিবুক ধরে উঁচু করে মুখখানা দেখে বললো, ভালো মাল ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস একে, বল !

বাবাজী এবার বললো, আইজ্ঞে, চেক পোস্টের ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি !

ওদের একজন বললো, হুঁ, ক্যাপ্টেন সাহেবের জন্য ভেট ! কেষ্টদা ঠিকই ধরেছিল, ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে এর খুব দহরম মহরম। ডাক্তারকে ওখানে নিয়ে যায় প্রায়ই।

আর একজন বললো, ঐ সেপাইদের জন্য ও রেগুলার মেয়েমানুষ সাপ্লাই করে বোঝা যাচ্ছে !

বাবাজী আবার ধড়ফড় করে বললো, আইজ্ঞা না। এ জয় বাংলা থেকে

www.BanglaBook.org

এসেছে, তাই পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন সাহেব পার করে দেবেন।

—কেষ্টদার মাল নিয়ে যাবার কথা ছিল না তোর ?

—আমি পারবো না। আমারে ছেড়ে দ্যান !

—পারবি না কি রে শালা ? কেষ্টদা শুনলে জান লিয়ে লেবে !

ওদের মধ্যে যে নেতা গোছের, সে বাবাজীর বুকে একটা থাবড়া মেরে বললো, এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। ভ্যানের ওপর আগে মালের বস্তাগুলো চাপাবি, তার ওপর এই মেয়েটাকে বসিয়ে নিয়ে যাবি।

বাবাজী বললো, ও দাদারা, তোমাদের পায়ে পড়ি। আজগের দিনটা আমারে ছেড়ে দাও !

আর একটু জোরে থাবড়া মেরে দলপতি বললো, কেন, আজকের দিনটা এস্পেশাল কী আছে ? আজ কেন তোকে ছাড়বো ? আজ আমাবস্যা পড়েছে, আজই ভালো দিন !

আর একজন বললো, ওপার বাংলার মেয়ে তোর কাছে এসেছিল কেন ? রেগুলার কারবার আছে বুঝি ? তুই এই লাইনে আগেই নেমে পড়েছিস, তাই না ?

—না, না, না, আপনেরা ভুল বুঝবেন না। আমি সেসব কিছু করি না !

—চোপ !

একজন দাঁড়িয়ে রইলো পাহারায়, আর দু' জন ছুটে চলে গেল মাঠের মধ্যে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এসব জায়গায় এইটুকু বৃষ্টিভেজা কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। নতুন লোক দেখেও মেয়েটি কোনো সাড়াশব্দ করেনি। ত্রিলোচন যে বিড়াল পার করার কথা বলেছিল, সেটাই বোধহয় সবচেয়ে তার মনে লেগেছিল। তারপর থেকে সে আর কথা বলেনি একটাও। পাগল হলেও এইটুকু মান-অপমান বোধ আছে।

বেশি নয়, মোটে তিনটে ছোট ছোট বস্তা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ছেলেদুটো। তার মধ্যে কী আছে ভগবান জানে।

মেয়েটির পেছন দিকে বস্তা তিনটে সাজিয়ে তার ওপরে একটা গামছা ঢেকে দিল। একজন তার ওপর গুচ্ছের কাঁথার ডাঁটা সাজালো।

তারপর বললো, তোকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। তোকে বর্ডার অবধি যেতেও হবে না। তুই শুধু চেক পোস্টের সামনের রাস্তাটুকু পার করে দিবি। আগে মাল খালাস করে তারপর মেয়েটাকে নিয়ে যাবি ক্যাপ্টেন সাহেবের

www.BanglaBook.org

কাছে। বাই চান্স যদি তার আগে ধরা পড়িস, বলবি, তোকে ডাক্তারবাবু পাঠিয়েছে। কী, মনে থাকবে ? ডাক্তারবাবুর নাম বলবি, কেষ্টদার কথা খবর্দার মুখে আনবি না।

দলপতি জিজ্ঞেস করলো, মালটা কোথায় খালাস করবি, তা জানতে চাইলি না যে ?

বাবাজী তবু হাঁ করে আছে।

দলপতি বললো, চেক পোস্টের গেটে এখন কেউ বোধহয় থাকবে না। সবাই লাইনের দিকে যায়। তুই গেটের সামনেটা পার হয়ে সোজা লাইনের দিকে যাবি না কিন্তু। একটা বড় শিমুল গাছ আছে, তার পাশ দিয়ে আস্তে করে নেমে যাবি মাঠের মধ্যে। শিমুল গাছটা মনে আছে তো ? ঐটাই সবচেয়ে বড় গাছ তার পাশ দিয়ে নামবি, নেমে খাল পাড় ধরে চলে যাবি। ব্যাস আর কিছু করতে হবে না। সাইকেলের বেল দিবি না, খবর্দার, একদম চুপ মেরে থাকবি, ওখানে লোক আসবে, তারপর যা ব্যবস্থা করার ওরাই করবে। সব মনে থাকবে ঠিকঠাক ?

একজন তার আঙুলগুলো দিয়ে বাবাজীর গলাটা পেঁচিয়ে ধরে বললো, কোনোরকম বেগড়বাঁই করলে মুণ্ডু উড়ে যাবে ?

একজন অকারণে বাবাজীর নাকের ডগা দিয়ে একটা ছুরি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, একদম মুখ বন্ধ করে এই লাইনে লেগে থাক, এক বছরে তোর পাকা বাড়ি তুলে দেবো।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাইকেলে কে যেন আসছে পেছন থেকে, সেই ছোকরা তিনটে চোখের নিমেষে মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

সাইকেলের আরোহী একজন চেক পোস্টের সেপাই,। বোধহয় বাজার করতে গিয়েছিল, তার সাইকেলের দু' পাশে ঝুলছে দুটো জ্যান্ত মুর্গী। বাবাজীর দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে সে হিন্দী গান মুখে নিয়ে চলে গেল।

এবার বাবাজী কী করবে ? এগোলেও বিপদ, পিছোলেও নিস্তার নেই।

বাবাজী বা ত্রিলোচন কখনো বর্ডারের লাইনে কাজ করে নি বটে, কিন্তু অন্যদের মুখে অনেক কাহিনী শুনেছে। এ লাইনে যেমন পয়সা আছে বিস্তর, তেমনি জীবনের ঝুঁকিও যখন তখন। এখানে সব কিছুই চলে মুখের কথায়। এই যে তিনটে বস্তা তার ভ্যানে চাপিয়ে দিয়ে গেল, এর মধ্যে কিছু না হোক, দশ বিশ হাজার টাকার মাল থাকতেই পারে। এমনি এমনি রেখে গেল, বাবাজী যদি ঠিক জায়গায় না পৌঁছোয় তাহলে একদিন তাকে ছুরি খেতেই হবে। তাদের সঙ্গেই

www.BanglaBook.org

রিকশা চালায় পরাণ। লোহার ডাণ্ডা মেরে কারা যেন তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, প্রাণে বেঁচে গেছে কোনোক্রমে, তারপর থেকে পরাণ আর ঐ ব্যাপারে কোনোদিন মুখ খোলে না।

ডাক্তার নবেন্দু চৌধুরীকে দু' দিন এই ভ্যানে চাপিয়ে চেক পোস্টের ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে নিয়ে গেছে বাবাজী। একদিন একজন সেপাই তার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিল, তাকে চা খেতে দিয়েছিল। সেটাই বাবাজীর অপরাধ। এস্মাগলাররা ঠিক লক্ষ রেখেছে। তারা ধরে নিয়েছে চেক পোস্টের সেপাইদের সঙ্গে বাবাজীর খাতির হয়েছে, তারা বাবাজীকে ধরবে না।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বাবাজী অস্ফুট স্বরে বললো, হে ভগবান, রক্ষা করো !

মাল যখন চাপিয়েছে, তখন যেতেই হবে সামনে। বাবাজী আবার বললো, কী কঠিন পরীক্ষায় ফেললে আমায় ঠাকুর ! একই দিনে এতগুলো মার কি সহ্য করা যায় ?

আস্তে আস্তে চলছে ভ্যানটা, বাবাজীর পায়ে যেন শক্তি নেই।

আর কোনো লোক নেই রাস্তায়, দু' পাশে কোনো বাড়ি ঘরের আলোও দেখা যায় না, তবু যেন মনে হচ্ছে রাস্তায় ধারে ধারে কারা যেন লুকিয়ে তার ওপর নজর রাখছে।

মেয়েটা কেন পুরোপুরি কথা বন্ধ করে দিল ? এখন পালাবার চেষ্টা করলেও তো পারে। হাত বাঁধা নেই, পা বাঁধা নেই, যেদিক খুশী চলে যাক, বাবাজী কিছু বলবে না। সে একা একা সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিল, একা একাই ফিরে যাক, বাবাজী কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যায় !

ওপার বাংলায় ওর আপনজন কে আছে, সে কথা একবারও বলেনি। পরপুরুষে একবার ধরে নিয়ে গেলে, হিন্দু মেয়ের জাত যায়, মুসলমানের জাত যায় না ? ওর নিজের লোক কি আর ওকে ঘরে নেবে ?

হায়, এই দুনিয়ায় সবই উল্টো। সব কিছুর বিনিময়ে বাবাজী ওকে নিজের করে পেতে চেয়েছিল, তবু সে পাবে না। এ মেয়েকে পেলে সে মাথায় করে রাখতো। আর যারা ওকে লাথি-ঝাঁটা মারবে কিংবা কামড়ে-ছিঁড়ে খাবে, তাদের কাছেই এই মেয়েকে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

মাল খালাস না করে আগে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে না। সেপাইরা যদি দৈবাৎ টর্চ মেরে কাটোয়ার ডাঁটা আর গামছা দ্যাখে ! ঐ বস্তা

www.BanglaBook.org

তিনটের মধ্যে কী বস্তু আছে কে জানে ! বস্তাগুলো ছোট বলেই মনে হয় বেশি দামি। চিনির বস্তা, চালের বস্তা হলে বোঝা যেত !

এই সেই আকাশী বটতলা, এই পেল্লায় বট গাছের নীচে প্রথম নেমেছিল জোছ্ছনাকুমারী।

প্রথম শোনেন বটবৃক্ষের অতি গুপ্তকথা
প্যাঁচা আর প্যাঁচানী শুধু জানে সে বারতা
আহা অতি গুপ্ত কথা···

বাবাজী পেছন ফিরে ভালো করে দেখে নিল, না জোছ্ছনাকুমারী অদৃশ্য হয়ে যায়নি, একইরকম ভঙ্গিতে বসে আছে সেই মেয়ে। আকাশে একবার বিদ্যুৎ চমকালো।

কালো কেশে বিজলি খেলে চক্ষে ঝরে পানি
কার ঘরণী কার বা কইন্যা কিছুই না জানি
আহা চক্ষে ঝরে পানি····

এই মেয়ে সম্পর্কেও কিছুই জানা গেল না। পালা গানটা পুরো লেখা হলো না, হবেও না আর।

এই মেয়ে যে এমন চুপ মেরে গেছে, তার একটাই মানে হয়। সে ওপার বাংলায় ফিরে যেতেই চায়। তবে আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী। ভালোয় ভালোয় ফিরুক।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, তার মধ্যে হঠাৎ বটগাছে ডেকে উঠলো তক্ষক। এই তক্ষকটা সাতবার ডাকে। কী যেন সে ঘোষণা করছে। কয়েকটা পাখি ভয় পেয়ে চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠলো।

সন্ধের পর এই বটতলায় বড় একটা কেউ আসে না। এখানে যদি একটু ভ্যানটা থামানো যেত। মেয়েটা না হয় চলেই যাবে, তবু যদি একটুক্ষণ ভালোয়-মন্দ কথা শোনাতো তা হলেও প্রাণটা কিছু জুড়োতো।

বাবাজী শেষবারের মতন বললো, আমরা তোমারে বাড়িতে আর রাখতে সাহস করলুম না গো, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করে দিও। ইদিকে পুলিশের বড়

www.BanglaBook.org

কড়াকড়ি। ত্রিলোচন লোক খারাপ না, তার বউরেও দ্যাখো, তোমারে তো খাওয়ায়ে-পরায়ে রেখেছিল, কিন্তু তুমি মোছলমানের বউ বলে···

বাবাজী কাকে বলছে এসব কথা, কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। ও মেয়ের চেতনা আছে কি না সেটাই বোঝা যায় না।

কিসের যেন একটা খচরমচর শব্দ হলো বটগাছের তলায়। শেয়াল, না মানুষ ? কোনো বিশ্বাস নেই, এখানে থামা চলবে না। পরের মূল্যবান জিনিস তার কাছে গচ্ছিত আছে। বাবাজী আবার জোরে প্যাডেল চালালো।

চেকপোস্টের গেটের কাছেও কোনো আলো নেই, পাহারাদার নেই। আগেরদিন ভেতরে ঢুকে বাবাজী দেখেছে যে কোয়ার্টারগুলোর পেছনে একটা খুব উঁচু মাচা আছে, তারে বলে ওয়াচ টাওয়ার। রাত্তিরে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেপাইরা চারদিকে আলো ফেলে দ্যাখে।

রাস্তা ছেড়ে শিমুলগাছের পাশ দিয়ে ঢালু জমিতে নেমে গেল বাবাজী। তার সাইকেলে বেশি শব্দ হয়নি, কিন্তু বুকের মধ্যে এমন ধড়াস ধড়াস করছে যে সেটাই যেন বাইরে থেকে শোনা যায়। ত্রিলোচন জানতে পারলে মারতে উঠবে, কিন্তু বাবাজীর কি অন্য উপায় ছিল ?

খালের ধার দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রিকশা। এই খালে জল খুব কম, কিন্তু রিকশা নিয়ে পার হওয়া যাবে না। কাদায় গেঁথে যাবে। আর কতদূর যেতে হবে, কে আসবে মাল নিতে ? এই খালটা বর্ডার পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। মাঝে কোথাও বাঁধ আছে কি না বাবাজী জানে না।

এক জায়গায় রিকশা থেমে গেল, সামনে ঝোপ-জঙ্গল, আর যাওয়া যাবে না।

মাটিতে শুয়েছিল দু'তিনজন লোক, হঠাৎ ভূতের মতন তারা উঠে দাঁড়ালো। একজনের হাতে ছোট্ট সরু একটা টর্চ। সে ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বললো, এত দেরি হলো ক্যানরে ?

গলা শুনেই বোঝা গেল, সে কেষ্ট গড়াই।

ধুপধাপ করে নেমে গেল বস্তাগুলো। কেষ্ট গড়াই চট করে একবার টর্চ জ্বেলে দেখে নিল মেয়েটিকে। তারপর তার হাত ধরে বললো, নেমে আয় !

বাবাজী বললো, ওকে নামাচ্ছো কেন, ওকে আমি ক্যাপ্টেনসাহেবের কাছে

কেষ্ট গড়াই বললো, ওপারে যাবে তো ? আমার মালের সঙ্গে আমি পৌঁছে দেবো।

www.BanglaBook.org

বাবাজী বললো, না, ওরে ছেড়ে দাও ! তোমাদের জিনিস ঠিকঠাক পৌঁছে দিইছি ;

মেয়েটিকে জোর করে নামাতে যেতেই সে এতক্ষণ বাদে মুখ খুলে বললো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমি···

কেষ্ট গড়াই মেয়েটার মুখ চাপা দিয়ে এক ঝটকায় নামিয়ে আনলো ভ্যান থেকে। অন্য দুজন দুমদাম করে ঘুষি মারতে লাগলো বাবাজীর মুখে। ওরা হিসহিসিয়ে বলতে লাগলো, খবরদার, একটা কথা বলবি না কারুরে। সোজা বাড়ি চলে যাবি। বাঁচতে চাস তো মুখ খুলবি না !

মূর্খ বাবাজী ভেবেছিল, গুণ্ডা-স্মাগলারদেরও বুঝি নিজস্ব কোনো ন্যায়-ধর্ম থাকে। তাদের মাল নিয়ে আসার কথা ছিল, বাবাজী মাল পৌঁছে দিয়েছে, চুক্তি ঠিক আছে। কিন্তু ওরা মেয়েটার গায়ে হাত দেবে কেন ?

ওরা বাবাজীকে মারছেই বা কেন, তাও সে বুঝলো না। এত মার খাওয়া তার অভ্যেসেও নেই, বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নীচে।

খানিক বাদেই তার জ্ঞান ফিরলো। ঠোঁট কেটে গেছে। মাথায় অসহ্য ব্যথা। ভ্যান গাড়িটাকে বড় রাস্তার ওপর তুলে দিয়ে গেছে ওরা। মেয়েটার কোনো চিহ্ন নেই।

চেকপোস্টের গেটে এখন একটা আলো জ্বলছে টিমটিম করে। ভ্যানগাড়ি ছেড়ে বাবাজী টলতে টলতে সেইদিকে দৌড়োলো। কেষ্ট গড়াইয়ের দলবল মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে, ওরা তার সর্বনাশ করবে। মেয়েটা শেষপর্যন্ত বাবাজীর কাছে থাকতে চেয়েছিল।

ক্যাপ্টেনসাহেব, ক্যাপ্টেনসাহেব বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বাবাজী ঢুকে পড়লো গেটের মধ্যে।

গেটে পাহারাদার না থাকলেও রান্নাঘর থেকে একজন সেপাই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো। কৌন হ্যায় ? হুকুমদার !

দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে সে তাক করলো মাতালের মত ওই ছায়ামূর্তিটার দিকে।

বাবাজী দু হাত তুলে বললো, মেরো না ! আমারে ক্যাপ্টেনসাহেবের কাছে নিয়ে চল, আমার মহাবিপদ।

বলতে বলতেই হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে বাবাজী পড়ে গেল মাটিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

ওয়াচ টাওয়ারের ওপর থেকে জিন্দাল চেঁচিয়ে উঠলো, হোয়াইট ফ্লাগ ! হোয়াইট ফ্লাগ ! ক্যাপটেনসাবকো বাতাও !

নিজেই সে দুদ্দাড় করে নেমে আসতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। শুধু লোহার রড দিয়ে তৈরি করা খাড়াই সিঁড়ি, সাধারণ লোক উঠতে-নামতেই ভয় পাবে, জিন্দাল পেছন ফিরে নামার বদলে সামনে তাকিয়েই নেমে আসে, একতলা সমান উঁচু থেকে সে লাফ দিয়ে পড়ে মাটিতে। তার গলায় ঝোলানো বায়নোকুলারটা সে চেপে ধরে আছে।

সকাল সাড়ে সাতটা বাজে। ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং এর মধ্যেই উঠে ফিটফাট হয়ে পায়চারি করছে লম্বা বারান্দায়। হাতে তার একটা ব্যাটন, কপাল কোঁচকানো।

জিন্দালের ডাক শুনে সে নিজের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ে জুতোর ওপরে রবারের গামবুট পরতে লাগলো। কাদা পেরিয়ে যেতে হবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল আয়নার সামনে তার পাগড়িটা একটু ঠিক করে নিল, মুখটা মুছলো রুমাল দিয়ে।

সে আবার বেরিয়ে আসতেই জিন্দাল স্যালুট ঠুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, উ লোগ হোয়াইট ফ্লাগ দেখায়া ক্যাপ্টেন !

পরমজিৎ ব্যাটনটা তুলে জিন্দাল ও আর একজন হাবিলদারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, তুমলোগ স্ট্রেচার লেকে আও !

এতখানি লম্বা শরীর হলেও কক্ষনো ঝুঁকে হাঁটে না পরমজিৎ সিং। সে একেবারে টানটান সোজা হয়ে থাকে। মুখের ভাবটা অনেকটা পাথরের মূর্তির মতন, এক এক সময় মনে হয় যেন তার চোখের পলক পড়ে না।

ওয়াচ টাওয়ারের খানিকটা পরে একটা দেওয়াল, পাকিস্তানী আমলে এই দেওয়ালের মধ্যে ছোট ছোট গর্তে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে সবসময় পাহারার ব্যবস্থা ছিল, এখন আর তার দরকার হয় না। দেওয়ালের খানিকটা অংশ ভেঙেও গেছে, সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে পরমজিৎ সিং নেমে গেল নীচে।

এর পরে শুধু অগভীর জলাভূমি, ঝাউগুলার মধ্যে মুরগীর পালক ভাসছে। অত্যধিক বৃষ্টির জন্য পিলারগুলো ডুবে গেছে। একটা কুকুর বাংলাদেশের দিক থেকে এইমাত্র চলে এলো সীমান্ত পেরিয়ে, একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে গা ঝাঁকানি দিয়ে জল ঝাড়ছে।

www.BanglaBook.org

হাতের ব্যাটনটা ঘোরাতে ঘোরাতে পরমজিৎ সিং জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলো ছপছপ করে। তার পেছনে পেছনে একটা স্ট্রেচার বয়ে আনছে জিন্দাল আর একজন।

এককালে এখানে কিছুটা অংশ নো ম্যানস ল্যাণ্ড ছিল, যখন পুরোপুরি চুঙ্গি, ইমিগ্রেশানের জন্য এই চেকপোস্টটা চালু ছিল। এখন অবশ্য সেই জায়গাটা আর চেনা যায় না। তবে চাষের সুবিধে নেই বলে দু দিকের কেউ এখানকার জায়গা দখল করেনি। বাংলাদেশের জেলেরা মাঝে মাঝে এই জলা জায়গায় মাছ ধরতে আসে, ভারতের দিকটায় সেরকম জেলে নেই। অবশ্য গুঁড়ো মাছ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, ইণ্ডিয়ার দিকের অবাঙালী হাবিলদাররা সেই মাছ সম্পর্কে আগ্রহীও নয়।

বাংলাদেশের দিকটা একটু উঁচু। জলকাদা পেরিয়ে এসে ওপরে উঠে পরমজিৎ সিং মাটিতে পা ঠুকতে লাগলো। তার ডান পায়ের গামবুটের ওপর কিলবিল করছে একটা জোঁক।

আরও খানিকটা দূরে একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন গিয়াসুদ্দিন কামাল, বাংলাদেশ চেকপোস্টে পরমজিতের কাউণ্টার পার্ট।

গিয়াসুদ্দিনের চেহারা ও স্বভাব অবশ্য সম্পূর্ণ উল্টোরকম। তার দাড়ি গোঁফ নেই, মাথার চুল পাতলা, তেমন লম্বাও সে নয়, বরং গোলগাল, মুখখানা হাসিমাখা। এত সকালে ইউনিফর্ম পরার অভ্যেস তার নেই, তবু সে কোনোক্রমে গায়ে চাপিয়ে এসেছে, জামার সবকটা বোতাম লাগায়নি, কোমরের বেল্ট আলগা।

প্রথমে সে পরমজিৎ সিংয়ের স্যালুউটের উত্তরে পায়ের জুতো ঠুকে একটা স্যালুউট দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে বললো, আসেন, আসেন সিংজী! অ্যাত্ত বেহানেই কী খবর কন?

পরমজিৎ সিং পেছন ফিরে জিন্দালদের বললো, তোমরা স্ট্রেচারটা সাহেবের ঘরে নামিয়ে রেখে ফিরে যাও!

গিয়াস কামাল কৌতূহলী হয়ে বললো, ওটা আবার সঙ্গে কী আনছেন?

পরমজিৎ সিং উত্তর দিল, আপনার জন্য একটা গিফ্‌ট এনেছি!

গিয়াস কামাল বললো, লাশ নাকি? হায় আল্লা, ঘুম থিকা উইঠ্যাই লাশ দর্শন!

এদের দিকের চেকপোস্টে একটি মাত্র পাকা ঘর, বাকি কয়েকটা তাঁবু।

www.BanglaBook.org

বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় টেবিল ও চেয়ার পাতা হয়েছে। সেখানে বসে গিয়াস কামাল সিগারেট ধরাবার আগে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল, পরমজিৎ সিং ইঙ্গিতে প্রত্যাখ্যান করলো।

ক্যাপ্টেন গিয়াস কামাল বললো, চা খাবেন তো ?

—আই ডোণ্ট টেক টি !

—ওঃ হো। ভুইল্যা যাই। আপনি সিগারেট, চা-কফি কিচ্ছু খান না। নো মাইনর ভাইসেস ! তা হলে একটা কোক ! আপনাগো ওদিকে তো কোকাকোলা পাওয়া যায় না। একটা খান !

—থ্যাঙ্কস ! এবার কাজের কথা শুরু করি ?

—আরে মশয় বসেন তো ! এত ব্যস্ত হবার কী আছে ? আপনের সঙ্গে কথা কইয়া আরাম আছে, এত ভালো বাংলা জানেন ! আপনের আগে যে ক্যাপ্টেন আছিল, গাড়োয়ালী না কী যেন, তার পাহাড়ী হিন্দীও আমি বুঝি না, সেও আমার ইংরাজি বোঝে না !

কাল সারারাত অনেক বৃষ্টি হয়েছে, আজ আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

এদিকে প্রচুর গাছপালা, কাছেই যে গ্রামটি দেখা যাচ্ছে সেটি যেন একেবারে গাঢ় সবুজে ঘেরা। আজকের বাতাস বেশ পাতলা, আর্দ্রতা নেই। ডান পাশের মাঠে কে যেন কাকে বেশ জোরের সঙ্গে ডাকছে, সেই ডাকার মধ্যে একটা সুর আছে। এক ঝাঁক শালিক কিচিরমিচির করছে দুটি তাঁবুর ফাঁকে। তাদের পাশ দিয়ে শরীর দোলাতে দোলাতে চলে গেল এক জোড়া হাঁস। সাঁ করে উড়ে এসে একটা বহুবর্ণ কাঠঠোকরা বসলো নিমগাছটায়, সেদিকে পক্ষীপ্রেমিক পরমজিৎ সিং-এর চোখ আটকে গেল।

সকালবেলার এই প্রকৃতির সুসামঞ্জস্যের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়ে যান্ত্রিক শব্দ তুলে এসে পৌঁছালো একটা জিপগাড়ি। তার থেকে একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক নেমে কাছে আসতে আসতে বললো, আস্‌সালামো আলাইকুম, কামালসাহেব। গুড মর্নিং !

লোকটি চেয়ার টেনে বসবার পর ক্যাপ্টেন গিয়াস কামাল বললো, লেট মি ইনট্রোডিউস, ইনি জনাব ইমতিয়াজ হোসেন, লোকাল থানার ওসি, আর ইনি হইলেন ইণ্ডিয়ান সাইডের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন পরমজিৎ সিং, ফার্স্ট ক্লাস বাংলা বলেন।

পরমজিৎ বেশ বিরক্ত হলো। সে এসেছে ক্যাপ্টেন গিয়াসুদ্দিন কামালের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে জরুরি বিষয় আলোচনা করতে। সেখানে অন্য লোক থাকবে কেন ? এরা কি প্রোটোকল মানে না ? থানার দারোগা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের আণ্ডারের লোক, তার সামনে কি সব কথা বলা যায় ? প্রটোকল অনুসারেই পরমজিৎ এখানে জিন্দালকেও বসতে বলেনি।

দুজন আলাদা খিদমদগার কোকাকোলা এবং চা এনে দিল। পরমজিৎ সিং-এর নিজস্ব কোনো আর্দালি নেই। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে গিয়াস কামালের হুকুম তামিল করার জন্য সব সময় দুতিনজন আর্দালি-খিদমদগার মজুত থাকে। শুধু চা চাইলে তার সঙ্গে আসে কেক। এরা আছে বেশ ভালো।

দারোগাবাবুটি বললো, ক্যাপ্টেনসাহেব, আমার কিছু মেডিসিন লাগবে।

গিয়াস কামাল বললো, বসেন, বসেন, ওই সব কথা পরে হবে। ক্যাপ্টেন সিং, কাল রাতে আপনাদের সাইডে ফায়ারিং শুনছিলাম মনে হয়। আরে মশয়, এখন তো আসতেছে শুধু পাল পাল গোরু। ওইগুলা আটকাইয়া কী হবে ? ওইসব রোগা রোগা গোরু ইণ্ডিয়াতে কোনো কাজে লাগে না, শুধু শুধু যায় ভাগাড়ে। এদিকে তবু কাজে লাগে। ঈদের সময় গোরুর খুব ডিমাণ্ড। এত গোরু পাবে কই ? রোজই তো বিশ-পঞ্চাশটা গোরু ঢোকে দেখি। আমি শুধু চাইয়া চাইয়া দেখি, কিছু কই না। জন্তু-জানোয়ারের তো পাসপোর্ট লাগে না, হা-হা-হা-হা !

পরমজিৎ হাসলো না, সামান্য একটু ঠোঁট বেঁকালো মাত্র। যে-সব পশুপাখি মানুষের সম্পত্তি নয়, এখনো স্বাধীন, তারা যখন তখন বর্ডার পার হয়ে যাওয়া আসা করতে পারে বটে। কিন্তু গোরু একটা দামি প্রাণী। এদিকে গরু পাচার করলে তার বদলে ইন্ডিয়াতে অন্য কোনো বেআইনী জিনিস ঢোকে।

পরমজিৎ বললো, আমি গোরু নিয়ে কথা বলতে আপনার কাছে আসিনি। কিছু হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে সিরিয়াস আলোচনা হোবে।

—সক্কালবেলাতেই সীরিয়াস কথা ? হায় আল্লা। আপনি মশয় বহুৎ সিরিয়াস আদমি ! আপনার তো পাখির শখ, আপনারে একটা সুন্দর পাখি দেবো, খাঁচায় রাখছি।

—থ্যাংকস। কিন্তু আমি পাখি কেজ-এর মধ্যে রাখি না, আমি শুধু পাখি ওয়াচ করি।

—বার্ড ওয়াচিং ! খুব ভালো হেবিট। তা আপনার জন্য পাখিটা রাখছি, আপনি নিয়া খাঁচা খুলে উড়ায়ে দিতে পারেন। ওরে কে আছিস, রহমান, আবদুল, খাঁচাটা নিয়ে আয়।

www.BanglaBook.org

—ওটা এখন থাক। ক্যাপটেন কামাল, রিসেন্টলি একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে আমি খুব কনসার্নড ! আপনার সাইডে কিছু কিছু রেপ কেস হচ্ছে, আর সেই রেপ-এর ভিকটিমদের আমার সাইডে ফেলে আসা হচ্ছে !

—ঘুম থিকা ওঠতে না ওঠতেই রেপ-এর কথা ? তোবা তোবা তোবা !

গিয়াস কামাল মস্করা করতে গিয়েও পরমজিতের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে থেমে গেল। শার্ট থেকে বিস্কুটের গুড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে সে বললো, হুঁ, রেপ তো হয়ই মাঝে মাঝে, কিন্তু সেইডা একটা স্পেশ্যাল প্রবলেম। আমরা আর্মির লোকরা তা কী কইরা কমাবো ! এতে আমাদের কী করার আছে ?

পরমজিৎ গলায় খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে বললো, আপনার এদিকের রেপ ভিকটিমদের বর্ডার পার করে আমাদের ওদিকে কেন দিয়ে আসা হবে, আই ওন্ট টলারেট দ্যাট !

—কী করে বোঝলেন যে ভিকটিম আমাদের সিটিজেন ?

—আমি একজনকে সাথে নিয়ে এসেছি। শী ইজ আ মুসলিম উয়োম্যান !

—ইন্ডিয়ায় বুঝি মুসলিম উয়োম্যান রেপ্‌ড হয় না ? আপনাদের দেশের কাগজেই তো খবর থাকে। ইন্ডিয়া ইজ দা থার্ড লারজেস্ট মুসলিম কান্ট্রি। ক্যাপটেন সিং, আপনি একটা ডেড বডি আমাদের উপর গছাবার চেষ্টা করছেন, এটার মানে আমি বোঝলাম না। আপনাদের ঐ সাইডের কোনো ক্রাইম বুঝি গাপ করতে চান ? খুনের মামলা ? আমারে সব কথা খুইল্যা বলেন। আই মাইট ট্রাই টু কো-অপারেট উইথ ইউ।

পরমজিৎ সিং রাগের সঙ্গে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি কোনো ডেড বডি আনিনি। আমি কোনো কেস হাশ্‌আপ করতেও চাই না। উয়ো জেনানা আভি তক জিন্দা হ্যায়। শী ইজ আ মুসলিম গার্ল অ্যান্ড আ সিটিজেন অব পাকিস্তান··· নো, আই অ্যাম সরি, সিটিজেন অব বাংলাদেশ ! আপনি দেখবেন চলুন !

দারোগা ইমতিয়াজ হোসেন এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, চোখ পিটপিট করে শুনছে। দারোগাদের মধ্যে এমন সংযম সত্যি দুর্লভ।

ক্যাপটেন গিয়াস কামাল তাকে বললো, আপনেও আসেন হোসেনসাহেব। রেপ কেস যদি হয়, আপনারও জানা দরকার। এসব আপনাদের এখতিয়ারে পড়ে।

তিনজনে এগোলো পাকা বাড়িটির দিকে।

www.BanglaBook.org

কাল রাতে বাবাজী এসে খবর দেবার পর ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং নিজে রিভলবার নিয়ে ছুটেছিল। সঙ্গে জিন্দাল আর যোগিন্দর। কিন্তু মাঝখানে এক ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেছে।

ততক্ষণে সব শেষ। কেষ্ট গড়াই এবং তাদের দল মাল পাচার করে দিয়েছে নির্বিঘ্নে। বীণা কিংবা ফতিমা নামের মেয়েটির মুখ বেঁধে ধর্ষণ করেছে একজন না তিনজন, তা বোঝার উপায় নেই। পাশে পড়ে আছে একটা মদের বোতল। যাওয়ার আগে ওরা মেয়েটার মাথা থেঁৎলে দিয়ে গেছে।

রাগে-ক্ষোভে পরমজিৎ সিং অন্ধকারের মধ্যে শুধুশুধুই একটা গুলি চালিয়ে দিয়েছিল।

তবু কইমাছের মতন মেয়ে মানুষের প্রাণ। সে মরেনি।

ধরাধরি করে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল চেকপোস্টের মধ্যে। পরমজিতের কাছে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা থাকে, গরমজল দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো তার মাথার ক্ষত, তারপর পরমজিৎ নিজেই একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। ঝমঝমিয়ে খুব জোর বৃষ্টি নেমেছিল আবার। থামতে থামতে মধ্য রাত পেরিয়ে গেল। তখন মেয়েটি অজ্ঞানের মতন ঘুমোচ্ছে, তাকে আর নাড়ানো চাড়ানো হয়নি।

তাছাড়া, পরমজিৎ ঠিক করে ফেলেছিল, মেয়েটা যদি মরেই শেষ পর্যন্ত, তাহলে বাংলাদেশের দিকে গিয়ে মরুক। এই নারী হত্যার পাপ বাংলাদেশের ওপর গিয়ে বর্তাক, ওরাই তো নিজেদের দেশের মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারেনি, ঠেলে দিয়েছিল এই দিকে।

শেষ রাত থেকেই ওয়াচ টাওয়ার থেকে টর্চ-এর সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল, ভোরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শাদা পতাকা। দুই চেক পোস্টের কমান্ডারদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার এইটাই ওদের নিজস্ব ব্যবস্থা।

ক্যাপটেন গিয়াস কামালের অন্তত চার কাপ চা না খেলে সকালের জড়তা কাটে না। আর্দালি আর এক কাপ চা নিয়ে এলো, সেই কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতেই সে ঘরে ঢুকলো।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা সেই কন্যা এর মধ্যে উঠে বসেছে, শূন্যে দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখছে। তার চোখে মুখে মৃত্যুর ছায়া নেই। পাখির মতন পলকহীন চোখে সে কী যেন খুঁজছে।

তিনজন পুরুষকে দেখেই সে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত দিয়ে মুখ আড়াল

www.BanglaBook.org

করে বললো, আমারে আর মাইরো না। আমি বাড়ি যাবো, আমি বাড়ি যাবো !

ক্যাপটেন গিয়াস কামাল নরম গলায় বললো, বাড়ি নিশ্চয় যাবে। কেউ আর তোমারে মারবে না। তোমার বাড়ি কোথায় ?

মেয়েটি বললো, এইডা কোন দ্যাশ ? আমি আরব দ্যাশে যামু না !

গিয়াস কামাল বললো, না, তুমি বাড়ি যাবে। বলছি তো। তোমার বাড়ি কোথায় বলো আগে !

মেয়েটি আবার বললো, আমারে বাংলাদ্যাশে মারে। ইন্ডিয়াতেও মারে।

পরমজিৎ নিম্নস্বরে ইংরিজিতে বললো, অনেক অত্যাচারে মেয়েটির খানিকটা মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। ঠিক মতন উত্তর দিতে পারে না।

গিয়াস কামাল বললো, তাতো মাথা খারাপ হইতেই পারে। মাথার আর দোষ কী ? ধীরে ধীরে সব জানতে হবে। ওর নামটা আপনি জেনেছেন ?

পরমজিৎ বললো, ওর নাম বলেছে ফতিমা। ওর হাজব্যান্ডের নাম জয়নাল আলী। সেই হাসব্যান্ড মরে গেছে। টু টেল ইউ দা ট্রুথ। প্রথমে আপনাদের সাইডে একজন ওকে রেপ করে এবং সিভিয়ারলি উন্ডেড করে বর্ডারের ওপারে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমাদের ওদিকেও ওর ওপর একই অত্যাচার করলো পাজীরা। ক্রিমিন্যালরা দু'দিকেই সমান।

গিয়াস কামাল মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, হুঁঃ ! অনেক অত্যাচার হয়েছে, তাতো বোঝাই যাচ্ছে।

তারপর সে মুখটা নীচু করে জিজ্ঞেস করলো, ও ফতিমাবিবি, তোমার ঘরবাড়ি কোথায় আছিল মনে আছে ?

মেয়েটির চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। বিস্ময়ে ভুরু তুলে সে বললো, আমার নাম বীণা, আমার বাবার নাম মনীন্দ্র সাহা।

আচমকা কোনো ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দের মতন পরমজিৎ বললো, হোয়াট ?

একগাল হেসে গিয়াস কামাল বললো, শী ইজ এ হিন্দু গার্ল ! হিন্দু গার্ল ! মুখ দেখেই বোঝা যায় !

এবার দারোগাসাহেব বললেন, ঠিক কথা। মুখ দ্যাখলেই হিন্দু মনে হয়। লাল পাড় শাড়ী পরছে।

পরমজিত প্রবল প্রতিবাদ করে বললো, তা হতেই পারে না। ওর মাথার ঠিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই, ও কী বলছে তা ও নিজেই জানে না।

মেয়েটি বললো, আমার বাবার বাড়ি আগুনে পুইড়া গ্যাছে ! উঃ কী আগুন ! কী আগুন !

গিয়াস কামাল বললো, কথা বলার ধরন একেবারে হিন্দুদের মতন। ক্যাপটেন সিং, অপনাদের ইন্ডিয়ায় একটা অসুস্থ হিন্দু মেয়েকে কেউ আশ্রয় দিতে পারলো না। স্ট্রেচারে বয়ে এই পারে নিয়া আসছেন ?

পরমজিৎ বললো, হিন্দু হলে অসুবিধে ছিল না, এক গরিব বেচারা একে বাড়িতে নিয়ে রেখেছিল, যত্ন করেছে, কিন্তু মুসলিম বলেই কমপ্লিকেশান হয়। আমি ডেফিনিট যে এ মুসলমান।

গিয়াস কামালের মধ্যে আবার মজা করার ভাবটা ফিরে এসেছে। সে ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান দিয়ে, পরমজিতের প্রায় মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে বললো, মেয়েছেলেরা হিন্দু না মোছলমান, তা বোঝা শক্ত। লালন ফকিরের গান শোনেননি ? যদি সুন্নত দিলে হয় মোসলমান, নারীর তবে কী হয় বিধান ? বামন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কিসে রে ?' তার ওপর আপনি বললেন, মেয়েটি পাগল ! পাগলের কি হিন্দু-মোসলমান আছে ? তারা ঈশ্বর-আল্লা কিছু বোঝে ? বোঝে না বলেই তো পাগল হয় !

পরমজিৎ সিং চট করে আর কিছু বলতে পারলো না। সে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে। এরকম যে হবে, সে ভাবতেই পারেনি। এর আগে যে-ক'বার গিয়াস কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছে, পরমজিৎই বড় দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বড় ভাইয়ের মতন মুরুব্বিয়ানার সুরে কথা বলেছে।

গিয়াস কামাল আরও একটু রঙ্গ করে বললো, কেয়া সিংজী ! মোটে একখানা পাগলকে নিয়েই আপনি দিশা পাচ্ছেন না ? আমাদের এখানে কত পাগল ! আপনি আসছেন শুনে আমি ভাবলাম, সত্যি বুঝি কিছু সিরিয়াস ব্যাপার !

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে এক পা দিল।

দারোগা সাহেব বলে উঠলো, এই, এই, উঠিস না, চুপ করে বসে থাক !

মেয়েটি বললো, এইডা আমার বাড়ি না। এহানে আমারে কেউ চিনে না।

গিয়াস কামাল বললো, আহা, উঠুক না। ঘুইরা ঘাইরা দেখুক। যাও বইন, বাইরে যাইতে ইচ্ছা করে যাও। ঐ পিছন দিকে বাথরুম আছে। এখানে তোমারে কেউ কিচ্ছু কবে না, ভয় নাই !

পরমজিৎ এতক্ষণে একটা কথা খুঁজে পেয়েছে। সে গিয়াস কামালের

www.BanglaBook.org

চোখের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললো, মেয়েটি প্রলাপ বকছে, তাই শুনে আপনারা ধরে নিলেন ও হিন্দু ? ও আরবের কথা উল্লেখ করেছে, সেটা শুনেছেন ? আপনারা বুঝি হিন্দু মেয়েদেরও আরবে পাচার করছেন ? মুসলমান মেয়ে-পুরুষ তো অনেককেই ক্রীতদাস করে পাঠিয়েছেন জানিই, এখন বুঝি হিন্দু ধরেছেন ? আরবের টাকা এত মিষ্টি ?

এবার গিয়াস কামালের রেগে ওঠার পালা।

সেও মুখের হাসি মুছে গলা চড়িয়ে বললো, কী বললেন সিংজী ? আমরা মোটেই আমাদের দেশের মেয়েদের বিদেশে কাজ করতে পাঠাই না ! কী মুসলমান, কী হিন্দু ! হাঁ, প্রথম দিকে কিছু পাচার হয়েছিল বটে, আড়কাঠিরা গরিবদের মোটা মাইনের লোভ দেখাতো। কিন্তু এখন সব বন্ধ ! প্রত্যেকটা চেক পোস্টে, এয়ারপোর্টে স্ট্রং ভিজিলেন্স আছে, কোনো মেয়ে বিদেশে যায় না !

পরমজিৎ বললো, আপনাদের এয়ারপোর্ট দিয়ে যেতে পারে না, সেইজন্যই ইন্ডিয়ার এয়ারপোর্ট দিয়ে পার করা হয়। সবাই জানে !

—সিংজী, আপনার এ বিষয়ে যদি কোনো স্পষ্ট অভিযোগ থাকে তা হলে আপনি আপার লেভেলে গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে মুভ করুন। আমি এ সম্পর্কে কথা বলতে বাধ্য নই।

—ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমি কিছু বলছি না। আপনি উত্তেজিত হবেন না !

—মেয়েটা হিন্দু বা মুসলমান যাই-ই হোক, ও যে বাংলাদেশের নাগরিক, তা আপনি প্রমাণ করতে পারেন নাই। একটা পাগল ধরে নিয়ে এসেছেন !

—এখানকার লোকের অত্যাচারেই ও পাগল হয়ে গেছে। আমরা যখন ওকে প্রথম পাই, তখন থেকেই ওর মাথার ঠিক ছিল না। একটা কথা আমি বলে রাখছি, ভবিষ্যতে আমার এরিয়ার মধ্য দিয়ে যদি কেউ মেয়ে চালান দেবার চেষ্টা করে, আমি ছাড়বো না। আমি গুলি চালাবো ! মানুষের মাংস নিয়ে যারা কারবার করে, আমি তাদের নাগালের মধ্যে পেলেই খতম করবো !

—চালান গিয়া গুলি আপনার যত ইচ্ছা ! আমাদেরও গুলি আছে। ছোট দেশ বলে আমরা ভয় পাই না। আপনাদের থেকেও আরও অনেক বড় দেশ পৃথিবীতে আছে, সে কথা মনে রাখবেন। মোট কথা, ঐ পাগলকে আমি রাখবো না। আপনি ওরে ফিরৎ নিয়ে যান।

—ফিরৎ নিয়ে যাবো ?

www.BanglaBook.org

দারোগাসাহেব এবার হাত তুলে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান ! এত উত্তেজনার কিছু নাই। মনীন্দ্র সাহার বাড়ি আমি চিনি। মেয়েটারে আমি সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে পারবো !

পরমজিৎ আর গিয়াস কামাল দু'জনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল। গিয়াস কামাল এক ঝিলিক দারোগার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, এই বেওকুফটা আগে বলে নি কেন ? সে যখন ইন্ডিয়ান ক্যাপটেনটাকে যুক্তি দিয়ে প্রায় কাবু করে ফেলেছে, সেই সময় এই তথ্য ফাঁস করে দেবার কী মানে হয় ?

এই সুযোগটা নিয়ে পরমজিৎ শ্লেষের সঙ্গে বললো, তা হলে মনীন্দ্র সাহা নামে সত্যি কেউ আছে ? এই মেয়েটি বাংলাদেশেরই ? তাকে ইন্ডিয়ায় চালান দেওয়া হয়েছিল !

গিয়াস কামাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, ঐ নগেন্দ্র সাহার ইন্ডিয়াতেও একটা বাড়ি আছে কি না তা খবর নিয়ে দেখেন গিয়ে আগে। এখানকার হিন্দুরা অনেকেই ইন্ডিয়াতে কিছু না কিছু সম্পত্তি করে রাখে। দুই দিকেই পা দিয়ে আছে।

পরমজিৎ বললো, ইন্ডিয়ার অনেক মুসলিমও পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেয়। তাতে দোষের কী আছে ? কিন্তু এই মেয়েটিকে···

দারোগাসাহেব বললেন, আরে, আবার তর্ক শুরু করলেন ? এই হিন্দু মোছলমান নিয়ে তুলনা করতে গ্যালে এর আর শেষ পাবেন না। আমি বলি কী, সমস্যা তো মিটেই গেল। এই মেয়ে মণীন্দ্র সাহার বাড়ি যেতে চেয়েছে। সে বাড়ি আমি চিনি। বেশি দূর না, সাত আট মাইলের মইধ্যে। আমি ফেরার সময় ওরে সেখানে নামাইয়া দিয়া যাবো। ব্যাস !

আবার দুই ক্যাপটেন কয়েক মুহূর্ত নীরব। যুক্তি-তর্কে কার যে ঠিক জয় হলো, সেটা দু'জনের কেউই বুঝতে পারছে না।

দারোগাটির এই কথার পর আর নতুন করে তর্ক তোলাও যায় না।

গিয়াস কামালের স্বভাবই এই, সে বেশিক্ষণ গোমড়া মুখে থাকতে পারে না। একটু পরেই ফিক করে হেসে ফেলে সে হাত বাড়িয়ে বললো, নো হার্ড ফিলিংস !

পরমজিতও সেই হাত মুঠোর মধ্যে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, অফ কোর্স নট ! অফ কোর্স নট ! আমিই অল্পতে ভুলে যাই। বাচ্চা বয়েস থেকেই আমার এই দোষ !

www.BanglaBook.org

গিয়াস কামাল বললো, তাহলে আর একটা কোক খান ! আপনার জন্য যে পাখিটা ধরে রেখেছি, সেটা নিয়ে যান।

—ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমার ওখানে কবে আসবেন বলুন !

—যাবো সিংজী, আপনি ডাকলে যে-কোনোদিন যাবো। খাসীর মাংস যেদিন হবে আপনার মেসে, সেদিন সাদা ফ্ল্যাগ উড়াবেন। আপনার ঐ জিন্দাল নামের সেপাইটি ভালো রান্না করে। পরমজিৎ বাইরে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটি বাথরুমেই গিয়েছিল। একটু দূরে সে মাটির ওপর শুয়ে আছে। তার বিশেষ চলৎশক্তি নেই, বোঝাই যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে সে আকাশ দেখছে। সে কি আকাশের দিকেও তাকিয়ে ভাবছে, এটা কোন দেশ ? এটা কোন দেশ ?

সে পরমজিৎ সিংকে দেখতে পেল না।

পরমজিৎ সিং হাতের খাঁচাটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল জলাভূমির দিকে। আসবার সময় সে একটি আহত নারীকে সঙ্গে এনেছিল, এখন একটা খাঁচায় বন্দী পাখি নিয়ে ফিরছে।

জিন্দাল আর যোগীন্দার দাঁড়িয়ে আছে সীমান্তের ওপারে।

জল কাদা ভেঙে ফিরে এসে পরমজিৎ ভাঙা দেয়ালটার কাছে থামলো। মনটা তার এখনও খচখচ করছে, ধুরন্ধর গিয়াস কামালের কাছে শেষ পর্যন্ত সে জিতলো, না হারলো ? এছাড়া আর কীই বা করবার ছিল ? পাগল মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলে তার অপমানের আর কিছু বাকি থাকতো কি ? ওকে রেখে আসতে গিয়েছিল, রেখে আসা হয়েছে। তাহলে এটা তার জিৎই বলতে হবে।

মেয়েটা হঠাৎ নিজেকে হিন্দু বলায় খুব প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল পরমজিৎ। হিন্দু হলে তো রেখে দেওয়াই যেত ! ঐ রিকশাওয়ালাটা হিন্দু ভেবেই তো ঐ ধর্ষিতা মেয়েকেও বিয়ে করতে চেয়েছিল।

তাহলে শেষ পর্যন্ত হিন্দু পরিচয় জানার পর ওকে ফিরিয়ে আনাই কি ঠিক ছিল ? নাঃ, এ বড় জটিল ব্যাপার। যাকগে, মেয়েটি তার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে, সেইটাই তো ভালো, আশা করি, ও এবার সুখী হবে।

পরমজিৎ পাশ ফিরে বললো, জিন্দাল, বায়নোকুলার লাও !

জিন্দাল দৌড়ে নিয়ে এলো বায়নোকুলার। এখান থেকে ওটা চোখে লাগালেও বাংলাদেশ চেকপোস্টে মেয়েটিকে আর দেখা যাবে না। পরমজিৎ পাখির খাঁচার দরজাটা খুলে দিল।

www.BanglaBook.org

পাখিটা একটা বাচ্চা বুলবুলি। ছাড়া পেয়ে সে বাতাসে দু'পাক খেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ঐদিকেই চলে গেল।

চোখে বায়নোকুলার সেঁটে সেটাকে দেখতে দেখতে পরমজিৎ ফিসফিস করে বললো, যা, তুইও মণীন্দ্র সাহার বাড়ি চলে যা!

একটু পরে সে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে গাম বুট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো, রিকশাওয়ালাটা চলে গেছে?

জিন্দাল বললো, না, ক্যাপটেনসাব! সে আপনার ঘরের মাটিতে শুয়ে মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে। খুব জখম হয়েছে লোকটা।

নিজের ঘরে এসে পরমজিৎ দেখলো, চোখ মুখ একেবারে ফুলে গেছে বাবাজীর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বোধহয় সে কাঁদছিল, তার গালে চোখের জলের দাগ।

দরজার কাছে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিন্দাল আর যোগীন্দর। বাংলাদেশ চেকপোস্টে কী ঘটলো তা তারা সবিস্তারে শুনতে চায়। ক্যাপটেন সহেবকে এত গম্ভীর দেখে তাদের কৌতূহল আরও বেড়েছে।

পরমজিৎ বললো, ঠিক হ্যাঁ, আভি তুমলোগ যাও। বাদমে বাৎচিৎ হোগা!

ওরা সরে যাবার পর পরমজিৎ দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাবাজীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দেখতে লাগলো তার ক্ষত। চোখদুটা বেঁচে গেলেও দুই ভুরুর নীচে বড় বড় গর্ত, থুতনির কাছটা থুরে গেছে, নাকের ফুটোয় জমাট রক্ত। কী দিয়ে মেরেছে ওকে, শুধু হাত দিয়ে?

কাল রাতে এই লোকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার পুরো কাহিনীটা বলেছে! বাংলামুল্লুকে মানুষজন বড় দুর্বল হয়, তাই এত কষ্ট পায়। এদের অনেক রকম ইচ্ছে থাকে, কিন্তু ইচ্ছের জোর খাটাতে পারে না।

এই লোকটা এখানে কতক্ষণ ঘুমোবে? একে ডাক্তার দেখানো দরকার।

পরমজিৎ বাবাজীর একটা বাহু ধরে ঠেলে বললো, এই, উঠো, উঠো!

বাবাজী চোখ মেলে তাকালো। তারপরই ধড়ফড় করে উঠে বসে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো, সে মরে গেছে?

পরমজিৎ দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। তারপর মৃদু গলায় বললো, সে ভালো আছে, সে বেঁচে গেছে। তাকে আমি বাংলাদেশ চেকপোস্টে পঁহুছে দিয়ে এসেছি।

বাবাজী জিজ্ঞেস করলো, তাকে ওরা নিল? ওকে আর কষ্ট দেবে না?

www.BanglaBook.org

পরমজিৎ বললো, না, না। ঐদিককার ক্যাপটেন খুব আচ্ছা আদমি। সে দায়িত্ব নিয়েছে। তুমি চিন্তা করো না!

পরমজিৎ একবার মুখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েটি যে শেষ পর্যন্ত হিন্দু, তা এই রিকশাওয়ালাটিকে বলা যাবে না। ও আরও কষ্ট পাবে।

রুমাল দিয়ে মুখ মোছার ছলে চোখ ঢেকে পরমজিৎ বললো, তুমি ডাক্তার চৌধুরীর কাছে চলে যাও, দাওয়াই নাও! না দাওয়াই নিলে সেপটিক হতে পারে!

—সাহেব আমার ভয় করছে!

—কিসের ভয়?

—কেষ্ট গড়াই এবার আমাকে মেরে ফেলবে। সে আর তার দলের লোক আপনার কাছে আসতে বারণ করেছিল। আপনাকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিল।

মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে পরমজিৎ ঠাণ্ডা চোখে অপলকভাবে চেয়ে রইলো বাবাজীর দিকে। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে ভয় দেখিয়েছিল, তবু তুমি আমার কাছে এলে কেন?

এবার বাবাজী ফুঁপিয়ে উঠে একটা শিশুর চেয়েও অসহায় ভাবে বললো, ক্যাপটেন সাহেব, সেই মেয়ে, আমার সাথে আগাগোড়া একটা কথাও বলেনি, একবার মুখ তুলেও চায়নি, শুধু একেবারে শেষবেলায়, কেষ্ট গড়াই যখন তাকে জোর করে নামিয়ে নিতে গেল, তখন সে বলে উঠলো, আমি তোমার সাথে যাবো! ক্যাপটেন সাহেব, সে আমারে বিশ্বাস করিছিল! কিন্তু আমি অধম মানুষ, তারে বাঁচাবার শক্তি আমার নাই। তাই ছুটে এসিছিলাম আপনার কাছে।

—সে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে। আর দুঃখ করো না।

—এবার কেষ্ট গড়াই আমারে মারবে! ওদের হাত থেকে বাঁচা যায় না! বনের বাঘেরও দয়া মায়া থাকে, কিন্তু ওরা

—না, ওরা তোমাকে মারবে না। ওরা তোমাকে খাতির করবে!

—ক্যাপটেনসাহেব!

—শোনো, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। কেষ্টো গড়াইয়ের কাছ থেকে তুমি পালাবে না, সোজা তার সঙ্গে গিয়ে মোলাকাৎ করবে! ভয় পাবে না, বুক ফুলিয়ে যাবে। ওর লোক যদি আগে তোমায় ধরে, তুমি ফাঁটসে বলবে, ছাড়ো, কেষ্ট গড়াইয়ের সাথে আমার জরুরি কথা আছে।

www.BanglaBook.org

—কী বলবো ?

—কেষ্ট গড়াইকে বলবে, আরে। চেকপোস্টের ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং শালা এক মহা ঘুষ খোর ! তাকে ভয় পাবার কী আছে। সে হারামী শুধু টাকা চায়। তাকে দুশো তিনশো টাকা দিবে, এক বোতল মদ দিবে, তাহলেই তোমাদের সব মাল বর্ডার পার হয়ে যাবে।

বাবাজীর চোখ ড্যাবডেবে হয়ে গেল। ক্যাপটেন সাহেব কোন্‌দিকে কথা ঘোরাচ্ছে তা সে বুঝতে পারলো না।

পরমজিৎ বললো, মনে থাকবে কী বলবে ? কেষ্ট গড়াইকে বলবে, পরমজিৎ সিং, ঐ দাড়িওয়ালা সর্দারজীটা এক নম্বর ঘুষখোর আর মাতাল। টাকা আর মদ পেলেই খুশী, তারপর যত ইচ্ছে স্মাগলিং করো। কেষ্ট গড়াইকে আরও বলবে, তুমি পরমজিৎ সিং-এর সঙ্গে চুক্তি করো, হপ্তায় পাঁচশো টাকা করে দিবে, তারপর আর তোমার কোনো মাল আটকাবে না। ও শালা পাঁইয়া বাঁধাকপি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে ! এই বলে, এই লোভ দেখিয়ে, তুমি ওকে আজই ডেকে আনো···

একটু থেমে পরমজিৎ আবার বললো, ওকে একেলা আনবে, রাত্তির আটটা নটার পরে, শিমূল গাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তা খাল ধারে গেছে, সেইখান দিয়ে, যেখানে তোমার ভ্যান থেকে ও মেয়েটাকে নামিয়ে ছিল, সেখানে আমি মজুত থাকবো। ঠিক থাকবো। আমাকে দেখে তুমি সরে যাবে, পিছনে তাকাবে না, কোনোদিন আর দুসরা কোনো মানুষের কাছে মুখ খুলবে না। তোমার হয়ে আমি শোধ নেবো। ঐ কেষ্টো গড়াইকে আমি তখন একটা পাগলা কুত্তার মতন···

পরমজিৎ তার কোমরের রিভলভারে হাত দিল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। যেন সে চোখের সামনে তার বড় বহিনের আততায়ীকে দেখতে পাচ্ছে।

বাবাজী ভয় পেয়ে পরমজিতের হাঁটু চেপে ধরে বললো, সাহেব, সাহেব !

পরমজিৎ ভূতগ্রস্ত মানুষের মতন বললো, তুমি কেষ্টো গড়াইকে আমার কাছে নিয়ে এসো একবার। যে-কোনো উপায়ে ! যাও !

॥ ১০ ॥

দারোগা ইমতিয়াজ হোসেন আর ক্যাপটেন গিয়াস কামাল নাস্তা খেতে বসেছে।

এরা শুধু পুলিস আর আর্মির লোক নয়, সম্পর্কে দু'জনে ভায়রা ভাই।

www.BanglaBook.org

দারোগাটি বিয়ে করেছে বড় বোনকে, নিজেও পৌঁছে গেছে পৌঢ়ত্বে। গিয়াস কামালের তরুণী বধূটি অবশ্য এখানে থাকে না, সে আছে রাজসাহীতে। দারোগা সাহেবটি তার স্ত্রীর অনুরোধে প্রায়ই ছোট ভায়রাটির খবরাখবর নিতে আসে।

বাইরের টেবিলেই প্লেট পেতে দিয়েছে আর্দালি। গরম গরম পরোটা, ওমলেট, ভুনা গোস্ত, মুরগীর ঠ্যাং ভাজা এবং ছোলার ডাল। তারপর কাচের বাটিতে করে ক্ষীর। আর্দালি আরও পরোটা ভেজে এনেছে, দারোগা সাহেব হাত নেড়ে নেড়ে বললো, না, না, আমার আর লাগবে না। গিয়াস কামাল বললো, ন্যান, আর একখান ন্যান, ক্ষীর দিয়ে খাবেন।

এরপর চা এলো।

দারোগা সাহেব পেটে দুটো চাপড় মেরে বললো, বড় হেভি নাস্তা হয়ে গেল, আমি আজকাল সকালে বেশি কিছু খাই না।

গিয়াস কামাল তার দিকে পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বর সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলো, আপনারা এখানে মাছ ভালো পান না বোধহয়!

গিয়াস কামাল বললো, মাছ কোথায়? এদিকে এখন মাছ একেবারে নাই। আর কিছুদিন পর ইলিশের লরি আসতে শুরু করবে, ঐ পারে মাছের খুব ডিমান্ড, কিন্তু বরফ দেওয়া মাছে আমি কোনো টেস্ট পাই না।

—আপনার জইন্য দুইটা কাতল মাছ আনছি। আর কিছু ফ্রেস ভেজিটেবল। কারুরে বলেন গাড়ি থিকা নামাইয়া নিতে।

—আবার এই সব আনতে গ্যালেন কেন?

—আপনার বড় শালী পাঠাইছে। এ বছর খুব বড় বড় কুমড়া হইছে আমার কোয়ার্টারের বাগানে।

গিয়াস কামালের নির্দেশে আর্দালিরা দারোগা সাহেবের জিপ থেকে মালপত্র নামাতে লাগলো। নামাচ্ছে তো নামাচ্ছেই। এক জোড়া বেশ বড় কাৎলা মাছ, এক টিন ঘি, এক বস্তা আলু, অনেকগুলো কুমড়ো, ঝুনো নারকোল…

গিয়াস কামাল হাসতে হাসতে বললো, এ যে দেখি বিয়ের তত্ত্ব!

দারোগা সাহেবও হাসতে লাগলো। তার স্ত্রী যে কতরকম জিনিস গাড়িতে তুলে দিয়েছে তা সে নিজেও জানতো না।

অন্যান্য সেপাই-হাবিলদাররা কেউ এখনও দাঁতন করছে খালি গায়ে, কেউ

www.BanglaBook.org

ট্রানজিস্টার হাতে নিয়ে গোসল করতে যাচ্ছে। কাল রাতের অত্যধিক বৃষ্টিতে একখানা তাঁবু হেলে পড়েছিল, দু'জন সেটা মেরামত করতে লেগে গেছে।

সেই মেয়েটি এখনও চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। চার পাশে যে এত পুরুষমানুষ, সে ব্যাপারে যেন তার ভ্রুক্ষেপ নেই। যেন সে বুঝে গেছে, মাটি ছাড়া তার আর স্থান নেই কোথাও।

দু'একজন সেপাই তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আড় চোখে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না। তবে কেউ কেউ তার মুখখানা দেখে ভুরু কুঁচকে কী যেন মনে করবার চেষ্টা করছে।

দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলো, ইন্ডিয়ান সাইডের এ ক্যাপটেনের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ? সব সময়তেই ঝগড়া হয় নাকি ?

গিয়াস কামাল বললো, আরে না ! ঐ সর্দারজীটা সব সময় মাথায় পাগড়ী বাইন্ধা রাখে তো, তাই মাথা গরম। চ্যাঁচাইয়া ম্যাচাইয়া কথা কয়। কিন্তু লোক খারাপ না !

দারোগা সাহেব বললো, আমি তো আপনাগো তর্ক শুইন্যা আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিলাম। একটা মোটে মাইয়া মানুষ, তারে অরাও রাখতে পারে না, আপনেও রাখতে চান না ? একটা মাইয়ারে রাখতে কী লাগে ? আপনার বড় শালী ক'দিন ধরেই বলছে যে আমাদের কোয়ার্টারে আর একটা ঝি কিংবা চাকর রাখনের দরকার। আমিই ওরে কাজে লাগাতে পারি।

গিয়াস কামাল চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলো, আপনেরা অরে রাখবেন ?

দারোগাসাহেব বললো, রাখতে আমার আপত্তি নাই !

—আপনি যে বললেন আপনি মণীন্দ্র সাহার বাড়ি চেনেন ?

—জী, সেটা ঠিকই কইছি। মণীন্দ্র সাহারে আমি চিনি, তার বাড়িও চিনি, কিন্তু মণীন্দ্র সাহাও আর নাই, তার বাড়িও আর নাই।

—তার মানে ?

—মণীন্দ্র সাহা এককালে এদিকের বড় ব্যবসায়ী ছিল, তার বাড়িখানও বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সেভেন্টি ওয়ানে পাক আর্মি সেই বাড়ি পুড়ায়ে দিয়েছে। মণীন্দ্র সাহাও খুন হয়েছিল। সেই ফ্যামিলির আর কেউ নাই শুনেছি !

—সে কি ! এই কথাটা আপনি আগে বললেন না কেন ? ইন্ডিয়ান ক্যাপটেনের সামনে আপনি প্রমিজ করলেন, ঐ মেয়েকে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া যাবেন।

www.BanglaBook.org

—ঐ মাইয়া যদি যাইতে চায়, তাইলে সেই পোড়া বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেবো অবশ্যই।

—দ্যাখেন হোসেনভাই, একবার দায়িত্ব নিয়া পরে তা অস্বীকার করা আমার হ্যাবিট না। এর পরের বার যখন ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং দেখা হলে আমারে জিজ্ঞাসা করবে, মেয়েটারে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিছিলেন তো ? তখন আমি কী উত্তর দেবো ? আমি মিথ্যা কথা বলবো ?

—আহা হা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনেরে মিথ্যা বলতে হবে না। মণীন্দ্র সাহার বাড়িতেই নামিয়ে দেবো অরে।

—কিন্তু সেই পোড়া বাড়িতে যদি অইন্য কোনো লোক না থাকে, তাইলে ঐ মেয়েরে সেখানে একা রাখবেন কী ভাবে ? আবার তো শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে ওকে নিয়ে।

—তাতো করবেই !

—আরে, আপনি তো ভারি মজার কথা বলেন। মেয়েটারে বাড়ি পৌঁছাইয়া দেবার রেসপনসিবিলিটি নিয়া এখন বলছেন, তাতো করবেই !

—সেইজন্যই তো কইলাম, আমার বাসাতেই ও সবচেয়ে সেইফ থাকবে। বয়েসটা তো ভালো না, ঐ বয়েসের মাইয়ারে কোথাও একা রাখা যায় না ! শিয়াল-কুকুরের ভয় তো আছেই।

—কিন্তু ও যদি ভালো ঘরের হিন্দু মেয়ে হয়, আপনার কাছে দাসী-বাঁদী হয়ে থাকবে কেন ? সেইটা মোটেই ঠিক না।

—তাইলে আপনি এই প্রোবলেমের কী সলিউশান দেবেন ?

একজন আর্দালি কাপ প্লেট সরিয়ে নিতে এসেছে। দারোগা ও ক্যাপটেন তার উপস্থিতি গ্রাহ্যই করেনি। গিয়াস কামাল সব আর্দালির নামও মনে রাখতে পারে না, কারুকে ডাকতে হলে সে কই হ্যায় বলে চ্যাঁচায়।

এই আর্দালিটির নাম কাশেম। সে হঠাৎ সাহস করে সাহেবদের কথার মাঝখানে কথা বলে ফেললো। সে আর পেটের কথা চেপে রাখত পারছে না।

কাশেম বললো, আমি একটা কথা কবো, হ্যার ? ইন্ডিয়ার ক্যাপটেনছাবে যারে দিয়া গেল, ঐ বউডারে আমি চিনি। আমোগো পাশের গেরামের, অর নাম ফতিমা !

গিয়াস কামাল এক ধমক দিয়ে বললো, ধুৎ, কী বাজে কথা কস তুই ! ওর নাম বীণা, হিন্দু বাড়ির মাইয়া, নিজের মুখে নাম বলেছে। যা, যা, নিজের কাজে

www.BanglaBook.org

যা !

কাশেম তবু বললো, না, ছার, অর নাম ফতিমা।

গিয়াস কামাল আরও বিরক্তভাবে বললো, আরে গাধা ! ওর বাপের নাম মণীন্দ্র সাহাবাবু, হিন্দু, তার মাইয়া ফতিমা হয় ক্যামনে ?

কাশেম তবু জেদ করে বললে, ঐ ফতিমারই আগে নাম আছিল বীণা !

কাশেম বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীটি পুরোপুরি শোনার পর আর অবিশ্বাস করা যায় না।

এই অঞ্চলে সাহা পরিবারের কয়েক পুরুষ ধরে ছিল কাপড়ের ব্যবসা। বেশ সম্পন্ন অবস্থা। দেশ বিভাগের পর সেই সাহা পরিবার ক্রমশ ক্রমশ ভারতে চলে যায়, সেখানেও তারা দোকানপাট খুলে মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে।

শুধু যায়নি মণীন্দ্র সাহা। নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে। পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে সে নতুন জায়গায় নতুন ভাবে জীবন শুরু করার ঝুঁকি নেয়নি। স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল। অন্যান্য শরিকরা চলে যাবার ফলে তার সুবিধেই হয়েছিল, বসতবাড়িটা পেয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি, ব্যবসাতেও ছিল একাধিপত্য।

মণীন্দ্র সাহা যে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে যায়নি, তার আর একটা বড় কারণ, তার ছিল দুই বউ !

দুই বউ নিয়ে ভারতে গেলে সরকারি আইনেও ঝঞ্ঝাট ছাড়াও তার আত্মীয় স্বজন তাকে ছি ছি করতো। অথচ কোনো বউকেই সে ছাড়তে পারবে না। বড় বউ তার সংসারের কর্ত্রী, তিন সন্তানের জননী, আর ছোট বউয়ের সে আঁচল ধরা। মণীন্দ্র সাহা বাড়ি ফিরলে বড় বউ তার পা ধুইয়ে দেয়, আর সেই মণীন্দ্র সাহাই রাত্তিরে তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর পা টেপে।

এইভাবে সে সুখেই ছিল। পঁয়ষট্টি সনের যুদ্ধের সময়ও তার কোনো বিপদ হয়নি, গ্রামের লোকজন তাকে ভরসা দিয়েছে। সেই জন্যই একাত্তরের দুঃসময়টা সে ঠিক বুঝতেই পারেনি। পাকিস্তানী মিলিটারি পঁচিশে মার্চের পরেই বেছে বেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক মুসলমান ও সমস্ত সম্পন্ন হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মণীন্দ্র সাহা পালাতেও পারেনি, নিজের বাড়ির সামনেই গুলি খেয়ে মরে। তার দোকান-গুদাম সব লুট হয়ে যায়। সাহা পরিবারের সেই শেষ !

তার দুই স্ত্রী অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল। বড় গিন্নির বড় বড় তিনটি সন্তান আর

www.BanglaBook.org

ছোট বউয়ের শুধু একটি ছ'সাত বছরের মেয়ে। শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যায় তারা, এক সহৃদয় মুসলমান পরিবার খুব ঝুঁকি নিয়েও তাদের আশ্রয় দেয়।

সেই গণ্ডগোলের মধ্যেই কিছুদিন পর মণীন্দ্র সাহার বড় বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনোক্রমে সীমান্ত পার হয়ে চলে গেল পশ্চিবাংলায়। সেখানে তার বাপের বাড়ির লোকজন ছিল। কিন্তু ছোট বউ তার বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে রয়ে গেল।

কেন ছোট বউ গেল না?

ছোট বউয়ের নাম সবিতা, সে তার প্রৌঢ় স্বামীকে কোনোদিনই মন থেকে পছন্দ করতে পারেনি। তা বলে কি স্বামী মরে যাওয়ায় তার দুঃখ হয়নি? তা হয়েছিল ঠিকই। দিনের পর দিন সে কেঁদে কেটে ভাসিয়েছে। তবু তার বড় জা যখন পশ্চিমবাংলায় গেল সে সঙ্গে যেতে চাইলো না, তার কারণ, পশ্চিমবাংলায় তো তার নিজের বাপের বাড়ি নেই! তার নিজের বলতে ঐ ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

পশ্চিমবাংলায় গেলে সবিতাকে ঐ বড় জায়ের বাপের বাড়িতেই উঠতে হতো। তখন বড় বউ এতদিনকার পুষে রাখা সব রাগের শোধ নিত না? স্বামী বেঁচে থাকতে সতীনকে সে সহ্য করেছিল বাধ্য হয়ে। একবার পশ্চিমবাংলায় নিজের বাপের বাড়িতে স্বামী সোহাগিনী ছোট বউকে বাগের মধ্যে পেলে সে তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিত। সবিতাকে দাসী-বাঁদী করে পায়ের তলায় রাখতো নিশ্চিত। আর সতীনের মেয়েকে দুধের বদলে পিটুলি গোলা খাইয়ে মেরে ফেললেই বা আশ্চর্যের ছিল কী? বড় বউ এমনই দজ্জাল ছিল বটে।

এই সব বুঝেশুনেই সবিতা গেল না।

আর একটি কারণও ছিল।

যে বাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়ির একটি যুবক, তার নাম জহির, সে বড় মধুর ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিল সবিতাকে। জহির একজন সচ্চরিত্র তেজী পুরুষ, রাজনৈতিক কর্মী। মণীন্দ্র সাহার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, সাহা-বাড়িতে সে অনেকদিন খাওয়া দাওয়া করেছে, মণীন্দ্র সাহার একেবারে কনিষ্ঠা কন্যাটিকে কোলে তুলে আদর করেছে। সেই কনিষ্ঠা কন্যার নাম বীণা।

সবিতা পশ্চিমবাংলায় গেল না, জহিরের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হলো।

সে বড় দুর্যোগের প্রণয়। কারণ জহির নিজেই তখন পাক সেনাদের ভয়ে সব সময় বাড়ি থাকতে পারে না। এক সময় সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেল,

www.BanglaBook.org

আর ফেরে না। সবিতা আবার চোখের জলে বুক ভাসায়।

জহির অবশ্য একাত্তরের ডিসেম্বরে ফিরলো একটা খোঁড়া পা নিয়ে। কোনোক্রমে সে একটা ইস্কুল মাস্টারী জোগাড় করলো এবং বিয়ে করলো সবিতাকে। সবিতার মেয়ে বীণাকে তো সে আগে থেকেই পছন্দ করে। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই।

সমস্যার সৃষ্টি হলো অন্যদিক দিয়ে।

আদর্শবাদী জহিরের বড় বড় কথা তার চার পাশের অনেকেই সহ্য করতে পারে না। একাত্তরের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ কর্পূরের মতন উপে যেতে লাগলো দেশ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য যারা লড়াই করতে গিয়েছিল, দেশের জন্য যারা অনেক কিছু খুইয়েছে, একসময় তারা দেখলো এই নতুন দেশে তাদেরই যেন স্থান নেই। যারা দালালী করেছিল, তারাই এখন সর্বেসর্বা, মোল্লাতন্ত্র আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

জহিরের মুখের বড় বড় কথা ছাড়াও তার আর একটা বড় অপরাধ ছিল এই যে সে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেও সে তার বউকে ধর্মান্তরিত করেনি। তার বউয়ের নাম রয়ে গেল সবিতা, সে তার ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজো করে। জহির নিজে তার মেয়ে বীণাকে শেখায়, লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোর বাবার নাম মনীন্দ্রচন্দ্র সাহা, আমি তোর চাচা!

জহিরের এই বেয়াদপি কতদিন লোকে সহ্য করতে পারে?

জহির যে ইস্কুলে চাকরি করে, একসময় সেই ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট হলেন মোল্লা সাহাবুদ্দিন। তিনি জহিরের বাপ-দাদাদের চিনতেন, প্রথমে তিনি জহিরকে স্নেহের সঙ্গে চাপ দিলেন, তারপর ভয় দেখালেন, তারপর তার চাকরি খাবার হুমকি দিতে লাগলেন।

বয়েসের তুলনায় বীণার বাড়ন্ত শরীর। সে একেবারে ধর ধর করে বড় হয়ে গেল। ষোলো বছরেই তাকে পরিপূর্ণ যুবতী বলে বলে মনে হয়।

তখন তার চার পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলো ছেলেরা। তাতো হবেই, এ আর অস্বাভাবিক কী। কিন্তু এমনই কপাল, এই বীণাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠলো ঐ মোল্লা সাহাবুদ্দিনেরই মেজ ছেলে, যার ডাক নাম জামাল।

জামাল বেশ সুশ্রী, ভদ্র ছেলে, তাকে এমনিতে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই। জহির জানতো, তার স্ত্রীর ধর্ম সে বদল করেনি, মেয়ের নাম বীণাই রেখে দিয়েছে বটে, তবু বীণার জন্য কোনো হিন্দু পাত্র পাওয়া যাবে না। এই সব

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে হিন্দুরা যে বেশী গোঁড়া ! তাছাড়া গ্রাম দেশে হিন্দুর সংখ্যা এখন অনেক কমে এসেছে। শেখ মুজিব খুন হবার পর আবার দলে দলে হিন্দু চলে যাচ্ছে এদেশ ছেড়ে।

জামালকে অপছন্দ না করলেও মোল্লা সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলো না জহির। সে জেদ ধরে রইলো। মোল্লা সাহাবুদ্দিনও পাল্টা জেদ ধরলেন, এবার তিনি ঐ কাফেরকে পবিত্র ইসলামের আওতায় আনবেনই। তাঁর চাপে পড়ে জহিরের ইস্কুল মাস্টারির চাকরিটি গেল এবং গ্রামের আর পাঁচজনের সহায়তায় বীণাকে প্রায় জোর করে ধরে এনে বিয়ে দিলেন জামালের সঙ্গে।

বীণার অবশ্য এই বিয়েতে কোনো আপত্তি ছিল না, জামালকে তার বেশ মনে ধরেছিল। তার মা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজো করলেও বীণা তার দাদী-চাচীদের দেখে দেখে মুসলমানী রীতি নীতিতে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বিয়ের দিন সে স্বেচ্ছায় কলমা পড়ে মুসলমান হলো, তারপর জামালের সঙ্গে তার ভারী সুন্দর, গভীর ভালোবাসা জন্মালো।

জহির আর সবিতা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অন্য কোথায়, তাদের খবর আর কেউ জানে না।

বীণা হলো ফতিমা। সে মোল্লা সাহাবুদ্দিনের সব হুকুম মেনে চলে, যত্নের সঙ্গে তাঁর সেবা করে। মোল্লা সাহেব তাঁর এই পুত্রবধূর ওপর খুব সন্তুষ্ট। তাঁর বেশ বড় পরিবার, ছেলেরা নানারকম ব্যবসা করছে, সম্পত্তি বাড়ছে দিন দিন। তাঁর আরও পাঁচটি পুত্রবধূ আছে, তবু তিনি যেন ফতিমাকে কিছুতেই নজর ছাড়া করতে পারেন না। ফতিমার হাতের পান-তামুক না খেলে তৃপ্তি হয় না তাঁর।

অন্য অনেকের মধ্যে বেছে বেছে একজনের প্রতি অকারণে অত্যধিক স্নেহ বর্ষিত হলে তাতে যে স্নেহের পাত্র বা পাত্রীটিরই বিপদ বাড়ে তা বুঝতে পারে না বড়োরা। ফতিমা অন্য পুত্রবধূদের তো চক্ষুশূল হবেই আস্তে আস্তে। বিশেষত জহিরের বড় ভাইয়ের স্ত্রী রেহানার খুব রাগ জমতে লাগলো ফতিমার ওপর। শ্বশুরের ভয়ে সে প্রকাশ্যে কিছু বলে না।

ফতিমা অবশ্য সেসব কিছু টের পায়নি। জামালের সঙ্গে সে পরম সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু এত সুখ বেশিদিন তার কপালে সইলো না।

প্রথমে তার একটি সন্তান হয়েই মারা গেল। তারপর গেল জামাল।

শিশুমৃত্যু এমন আশ্চর্য কিছু না গ্রাম দেশে, কিন্তু জামাল একজন জলজ্যান্ত,

www.BanglaBook.org

স্বাস্থ্যবান পুরুষমানুষ, সে মাত্র দু'দিনের জ্বরে ধড়ফড় করে মরে গেল কী করে ? কেউ কি তাকে বিষ খাইয়েছিল ? মোল্লা সাহাবুদ্দিনের পরিবারে বিষ খাওয়াবার ঘটনা আগে একবার ঘটেছিল। তাইতেই কারুর কারুর সন্দেহ হয়। কিন্তু সে সন্দেহের কোনো ভিত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই তো মত্র আট ন'মাস আগের ঘটনা, ফতিমার স্বামী জামাল চলে গেল কবরে। তার জানাজার সময় ফতিমা একেবারে জবাই করা মুর্গীর মতন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিল গো ! অনেকেই চোখের পানি সামলাতে পারেনি !

এই পর্যন্ত বলে আর্দালি কাশেম থামলো।

এরপর ফতিমার কী হলো, কে তাকে বাড়ির বার করলো, কে বা কারা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ইন্ডিয়ার বর্ডারে ফেলে রেখে এসেছিল, তা সে জানে না।

কিংবা জানলেও বাকি অংশ সে বলবে না। তারও তো প্রাণের ভয় আছে।

গিয়াস কামাল হোসেন সাহেবের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, এই সব ঘটনা আপনি জানতেন ?

দারোগা সাহেব থুম মেরে গিয়ে দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

তিনি এই অঞ্চলের মানুষ, তাই মণীন্দ্র সাহার মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত শুনেছিলেন। তারপর তাঁকে বিভিন্ন থানায় বদলি হয়ে ঘুরতে হয়। অতি সম্প্রতি তিনি কাছাকাছি থানার ওসি হয়ে ফিরে এসেছেন। মাঝখানের এতসব কথা তাই তাঁর জানা নেই।

গিয়াস কামাল চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

যদিও সে আর্মির ক্যাপটেন, তবু সে পড়াশুনো করা লোক। সময় পেলেই, এমনকি কাজে ফাঁকি দিয়েও সে প্রচুর বই পড়ে। অধিকাংশই ইংরিজি বা বাংলা গল্প উপন্যাস।

বাঁ হাতের তালুর ওপর থুতনি রেখে সে বললো, ডুয়াল পার্সোনালিটি ! দ্বিধান্বিত সত্তা !

মাথার গোলমাল হবার পর থেকেই এই মেয়েটি নিজেকে কখনো হিন্দু, আবার কখনো মুসলমান বলে মনে করে। কোনোটাই মিথ্যে নয়।

কিন্তু কোন্ দেশে গিয়ে তার কোন্ পরিচয়টা বেশি কাজে লাগবে, সেটাই তার গুলিয়ে গেছে। সে মানুষ জনকে ভয় পায় বলেই দেশ চিনতে পারে না।

এক একটা বিয়োগান্তক গল্প বা উপন্যাস পড়ে গিয়াস কামালের খুব মন খারাপ হয়ে যায়। কান্না পায়। নায়ক কিংবা নায়িকার মৃত্যু হয় কেন ? লেখকরা

www.BanglaBook.org

কলমের এক খোঁচাতেই তো শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিতে পারেন। তা নয়, নায়ক-নায়িকাদের খুন করেই যেন লেখকদের বেশি আনন্দ।

গিয়াস কামালের মনে হলো তার চোখের সামনে এই তো এক জীবন্ত কাহিনী। এখানে সে লেখকের ভূমিকা নিতে পারে। সে-ই বাঁচিয়ে দিতে পারে এ কাহিনীর নায়িকাকে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলেন, আমিও আপনার সাথে যাবো।

দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ? আগে আমার কোয়ার্টারে চলেন, আপনের বড় শালীর সাথে আরও পরামর্শ করা যাবে।

গিয়াস কামাল বললো, আর পরামর্শের কী আছে ? ফতিমার খসম নাই, কিন্তু শ্বশুর তো আছে। মোল্লা সাহাবুদ্দিন একজন সম্মানিত লোক, তিনি যদি শোনেন যে তাঁর পুত্রবধূ এমন দুরবস্থায় পড়েছে, তাইলে কি তিনি আশ্রয় দেবেন না ? আস্তে আস্তে সবাই জেনে যাবে, এই ফতিমা মোল্লা সাহেবের পুত্রবধূ। সে যদি ধূলায় গড়াগড়ি খায়, তাতে কি মোল্লা সাহেবের সম্মান বাড়বে ?

দারোগা সাহেব বললেন, তা ঠিক !

—তবে আর দেরি কেন, চলেন !

—চলেন যাই। কিন্তু আমার কিছু মেডিসিনের দরকার ছিল।

—ওঃ হো ! এক্কেবারে ভুইল্যাই গেছিলাম।

উত্তেজনার বশে গিয়াস কামাল সত্যিই ভুলে গিয়েছিল যে তার বড় ভায়রাভাইটি যে এতসব উপহার দ্রব্য এনেছে, বিনিময়ে তারও কিছু দেওয়া উচিত।

দারোগাসাহেবের মেডিসিন মানে স্কচ হুইস্কি। তিনি ব্ল্যাক লেবেল ছাড়া অন্য ব্র্যান্ড পছন্দ করেন না। গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে জ্যাট কিংবা ওল্ট স্মাগলারের মতন আজেবাজে স্কচ খেতে হয়েছে বলে মুখটা বিস্বাদ হয়ে আছে, সেইজন্যই তো তিনি সাত সকালে ছুটে এসেছেন এখানে।

দুটি ব্ল্যাক লেবেলের লিটার বোতল, একটা কনিয়াক, এক ব্যারেল গুঁড়ো দুধ, ডজনখানেক চকলেট বার, কয়েক প্যাকেট চা সে ভরতে লাগলো একটা বস্তায়।

দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, শাড়ী নাই ? আপনের বড় শালী জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল

দু'খানা সিল্কের শাড়ীও ভরা হলো, তারপর সেই সব উঠলো জিপ গাড়িতে।

এবার দু'জনে এসে দাঁড়ালো মাটিতে শুয়ে থাকা ফতিমার কাছে।

www.BanglaBook.org

এত রোদের মধ্যেও সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। তার শাড়ীতে ছোপ ছোপ রক্ত। তার শরীরে এত অত্যাচার হলেও চোখ দুটি টলটল করছে আকাশেরই মতন।

গিয়াস কামাল দুঃখিত ভাবে বললো, ইন্ডিয়ান ব্যাটারা ওরে আনবার সময় একটা ভালো শাড়ী পরাইয়া আনতে পারে নাই ? ওদের কি শাড়ীর অভাব আছে ? এর শাড়ীটা চেইঞ্জ করাইয়া লই, কী বলেন ?

দারোগা সাহেব বললো, অত দরকার নাই। শ্বশুরবাড়িতে কী কেউ একখান শাড়ী দেবে না ? যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই নিয়া যাওয়া উচিত আমি মনে করি !

গিয়াস কামাল বললো, বীণা, ওঠো !

বীণা মুখ ফিরিয়ে শান্তভাবে বললো, আমি ফতিমা !

গিয়াস কামাল বললো, হ, তুমি ফতিমা। ঠিকই তো। আসো ফতিমা

ফতিমা সারা শরীরটা কুঁকড়ে ফেলার চেষ্টা করে বললো, আমারে আর মাইরেন না। আর মাইরেন না। আমি বাড়ি যাবো !

গিয়াস কামাল বললো, আল্লার নামে কশম খেয়ে বলছি, আমরা কেউ তোমারে মারবো না। তোমার আর কোনো বিপদ নাই !

ফতিমা বললো, এইটা কোন দ্যাশ ?

গিয়াস কামাল বললো, এইটা তোমার নিজের দেশ। চলো তোমারে বাড়ি নিয়া যাবো।

লক্ষ্মী মেয়ের মতন উঠে বসলো ফতিমা। কিন্তু হাঁটতে গিয়েই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল আবার। তার একটা পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা ফেটে গেছে, তা ছাড়া তার কোমরে ও বুকে ক্ষত।

এই চেকপোস্টে তো কোনো স্ত্রীলোক নেই যে তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবে। তাদের এখানে স্ট্রেচারও নেই। দ্বিধা না করে গিয়াস কামাল নিজেই মেয়েটিকে পাঁজকোলা করে তুলতে গিয়ে আগে বললো, তুমি ভয় পাইয়ো না, আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করবো না, তোমার চিকিৎসা করাতে নিয়া যাচ্ছি, গাড়িতে উঠাবো।

মেয়েটি কী বুঝলো কে জানে, হয়তো তার আর চ্যাঁচাবার শক্তিও নেই, সে চুপ করে রইলো। গিয়াস কামাল সাবধানে তাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল জিপের পেছন দিকে। তারপর জিপ ছুটলো গ্রামের পথে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর্দালি কাশেম তার কাহিনীর মধ্যে মোল্লা সাহাবুদ্দিনের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেয়নি।

মোল্লা সাহেবের আগেকার সে তেজ আর নেই। সম্প্রতি পক্ষাঘাতে তাঁর অঙ্গের একটা দিক পড়ে গেছে, হাঁটতে তো পারেনই না, কেউ বসিয়ে দিলে বসেন, শুইয়ে দিলে শুয়ে থাকেন। কথা বলেন বটে, কিন্তু কেউ বুঝতেই পারে না।

তবু তিনি তাঁর পুত্রবধূ ফতিমাকে চিনতে পারলেন। কোনোক্রমে তাঁর কম্পিত ডানহাতটা তুলে ফতিমার মাথায় রেখে দোয়া পড়লেন। তারপর দারোগা ও ক্যাপটেনের দিকে চেয়ে কী যে বললেন জড়িয়ে জড়িয়ে তার ওরা কিছুই মানে বুঝলো না। তবু এটা বোঝা গেল যে পুত্রবধূকে ফিরে পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন।

মোল্লা সাহেবের চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখে গিয়াস কামালেরও চোখ জ্বালা করে উঠলে। এই এক শুভ মিলনের দৃশ্য। সব ভালো, যার শেষ ভালো!

মোল্লা সাহেবের বড় ছেলের নাম গোলাম কাদের। মধ্যবয়স্ক গম্ভীর ধরনের মানুষ। গিয়াস কামাল আর হোসেন সাহেব এর সঙ্গে আলাপ সালাপ করলো কিছুক্ষণ। ফতিমাকে বাড়ির মেয়েরা ভেতরে নিয়ে গেছে, একজন চিকিৎসককে ডাকতে পাঠানো হয়েছে। মাথার গোলমাল থাকলেও শ্বশুরবাড়িটি দেখে চিনতে পেরেছে ঠিক ফতিমা, এখানে ঢোকার মুখে সে চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিল, শ্বাশুড়িকে দেখে সে তার পায়ে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। গিয়াস কামাল ভাবলো, এই বাড়ির পরিবেশে কয়েকটা দিন থাকলেই ফতিমার মাথার গোলমালও সেরে যাবে।

খানিকটা কাট ছাঁট করে ফতিমার প্রত্যাবর্তনের কাহিনীটা সে শোনালো গোলাম কাদেরকে। মাঝে মাঝে ফোঁড়ন দিলেন দারোগা সাহেব। ইন্ডিয়ান সাইডটাকে ভিলেইন বানিয়ে তিনি গল্পটা জমালেন। ফতিমা এখান থেকে কী করে গেল তা উহ্য রইলো, বর্ডারের ওপারে সে কতটা অত্যাচারিত হয়েছে, সেই বর্ণনাই প্রাধান্য পেল।

গোলাম কাদের গুম হয়ে শুনে গেল। যেন এ ঘটনায় সে এতই মর্মাহত হয়েছে যে কথাই বলতে পারছে না।

ওঠার আগে গিয়াস কামাল বললো, বিধবা হয়েছে, কিন্তু বয়েসটা তো বেশি

www.BanglaBook.org

না। ছেলেপেলেও নাই। আপনেরা দেখেশুনে ওর একটা নিকে দিয়ে দ্যান বরং।

গোলাম কাদের বললো, হুঁ।

অতিথিরা চলে যাবার পরেও সারাক্ষণ গোলাম কাদের নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তার ওপর এখন এই সংসারের ভার, কিন্তু আজ তার সংসারের কাজে কোনো মন নেই। সারা দিন সে বাড়ি থেকেও বেরুলো না।

মাঝে মাঝেই সে দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে লাগলো। যেন রাস্তায় বেরুলেই তার কোনো বিপদ ঘটবে। অথচ বাড়িতেও তার বিপদ কম নয়।

রেহানার সঙ্গে তার দেখা হলো প্রায় মাঝরাত্রে। সংসারের সব কাজ সেরে রেহানা শুতে এলো। বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছে তার স্বামী। তাদের পাঁচটি সন্তান অন্য ঘরে শোয়। গোলাম কাদের সিগারেট পর্যন্ত খেতে ভুলে গেছে।

রেহানা ঘরে ঢুকেই বললো, আবার সে ফিরে আসছে! এহনে কী হবে?

গোলাম কাদের চোখে যেন ভূত দেখার ভয়ের চিহ্ন। সারাদিন ধরে তো এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে সে, এখন কী হবে? ফতিমা কি সব বলে দেবে?

রেহানার চেহারাটি বিশাল, সে স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। গোলাম কাদের তার জরুর গোলাম। রেহানার ভাইগুলি শক্তিশালী পুরুষ। রেহানা একবার তার স্বামীকে ক্ষমা করেছে, দ্বিতীয়বার করবে না।

মোল্লা সাহাবুদ্দিন এখন অথর্ব, তিনি তাঁর পুত্রবধূদের মধ্যে কাকে বেশি স্নেহ করবেন, তাতে আজ আর কিছু আসে যায় না। এখন তিনি নিজেই কৃপার পাত্র। রেহানার হাতে সংসারের চাবি। ফতিমা ফিরে এসেছে, তাকে দুটি ভাত-কাপড় দিয়ে এ বাড়িতে রেখে দিতে রেহানার আপত্তি থাকার কথা নয়, অতটা নির্দয় নয় সে। এ বাড়িতে কত কুকুর বিড়ালও খায়, আর একটা মানুষ খাবে, তাতে আর কী! কিন্তু গণ্ডগোলটা যে অন্য জায়গায়।

গোলাম কাদের কাপুরুষ ধরনের হলেও কামার্ত। নিজের স্ত্রীর চোখের আড়ালে অন্য মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করে। সে বিধবা ভ্রাতৃবধূ ফতিমার দিকেও কু-নজর দিয়েছিল। বিশেষ কিছু করতে পারেনি অবশ্য। একদিন ভাঁড়ার ঘরে ফতিমা তখন তার ভাসুরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার জন্য ছটফট করছে, সেই সময়, পুকুরে স্নান করতে গিয়েও গামছা ফেলে গেছে বলে হঠাৎ ফিরে এসে রেহানা দেখে ফেলে সেই দৃশ্য।

www.BanglaBook.org

নিজে মেয়ে বলেই রেহানা বুঝেছিল যে ফতিমার আলাদা কোনো দোষ নেই, সে কাতরভাবে মিনতি করে নিজেকে ছাড়াবারই চেষ্টা করছিল, রেহানা নিজের কানে শুনেছে। দোষ তার স্বামীর। কিন্তু যে স্বামী তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ের বাপ, তাকে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। ফতিমাকেই ফেলে দেওয়া সহজ। তাছাড়া ফতিমার একটা দোষ তো আছেই, সে যুবতী বিধবা। জামালের শোকে সে এতই কাতর যে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব উঠলেই সে ফোঁস করে ওঠে।

স্বামীকে ক্ষমা করার একটাই শর্ত দিয়েছিল রেহানা, ঐ আগুনের ঢেলাকে বাড়ি থেকে বিদায় করতে হবে।

রেহানার নিজের একটা ছেলে বেশ বড় হয়েছে, প্রায় ফতিমারই সমান। যদি তারও মাথা ঘুরে যায় ? ফতিমা অন্য কারুকে শাদী করতে চায় না কেন, সে জামালের সম্পত্তির ভাগ দখল নিতে চায় ? সংসার সামলাতে হলে সব দিকে নজর দিতে হয় রেহানাকে।

ফতিমাকে বাড়ি থেকে সরাবার একটা বেশ সহজ ও লাভজনক উপায় পেয়ে গেল গোলাম কাদের। একেই বলে ভাগ্য ! খোদা একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে এই ভাগ্য তার হাতে তুলে দিলেন যেন।

তেলের টাকায় আরব শেখরা বড়লোক হয়েছে হঠাৎ। একেবারে পা ফুলে কলাগাছ। তাদের গিন্নিরা এখন নিজের হাতে কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না। এক একটি বাড়িতে আট দশটি দাসী লাগে তাদের। যে দেশে সবাই হঠাৎ বড়লোক, সেদেশে দাসী পাওয়া যাবে কোথা থেকে ? সুতরাং দাসী আনাও গরিব দেশ থেকে। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামেও আড়কাঠিরা ঘোরে আরব প্রভুদের সেবাদাসী সংগ্রহের জন্য।

সেইরকম এক আড়কাঠির কাছে ফতিমা বিক্রি হয়ে গেল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায়। রটিয়ে দেওয়া হলো, ঐ কুলটা স্ত্রীলোকটি পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়েছে।

ব্যাস, চুকে গেল ঝামেলা। অনেকগুলো টাকাও ঘরে এলো। সে টাকা দিয়ে বাড়ি মেরামত করা হয়েছে, গোলামের বাপের চিকিৎসা হয়েছে, বউয়ের গয়না হয়েছে। টাকা হাতে আসতে দেরি লাগে, খরচ হয় ঝড়ের বেগে। ক'দিনেই সেই টাকা ফক্কা !

এখন আবার ফিরে এসেছে সেই মেয়ে। একজন পুলিস আর মিলিটারি এসে পৌঁছে দিয়েছে। এবার উপায় ?

www.BanglaBook.org

তুমি হাটে নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ির গোরুটা বিক্রি করে দিয়ে এলে। টাকা নিয়ে অন্য জিনিসপত্তর সওদা করে ফেললে। তারপর যদি সেই গরু দড়ি-ছাড়া হয়ে তোমার বাড়িতে আবার ফিরে আসে, তুমি কি তাকে বাড়িতে রেখে দিতে পারো ? খদ্দের তোমায় ছাড়বে কেন ? সেই খদ্দের যদি কসাইও হয়, তবু তার হাতে তোমাকে আবার গোরু তুলে দিতে হবে। এইটাই হক্কের কথা কি না !

মায়া দয়া দেখিয়ে এখন যদি ফতিমাকে বাড়িতে রাখতে চাও তো রাখো, কিন্তু আড়কাঠি কি ছাড়বে ? তাকে পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ফেরৎ দিতে হবে না ? কোথায় পাবে সে টাকা ?

সেইজন্যই তো গোলাম আজ ভূত দেখেছে ! সে ভেবেছিল, এতক্ষণে ফতিমা আরবদেশে কোনো শেখের পা টিপছে।

রেহানা তার স্বামীকে আর ভয় দেখায় না। দু'জনে একসঙ্গে শলা পরামর্শ করে। চুপেচাপে, অন্যদের কিছু না জানিয়ে আবার ফতিমাকে ওদের হাতেই তুলে দিতে হবে অবশ্যই, কিন্তু মাস খানেক অন্তত সময় চাই, যাতে ফতিমার বাড়ি ফেরার গল্পটা থিতিয়ে যায়।

দিন তিনেক ডাক্তারের ওষুধ পেটে পড়তেই একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলো ফতিমা। এত অত্যাচার, এত শারীরিক নির্যাতন, তবু তার শরীর যেন সব হজম করে নেয়। তার সঙ্গে বেড়ালের উপমাটা নেহাৎ মন্দ দেয়নি ত্রিলোচন, কিছুতেই তার প্রাণ যায় না।

আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসে ফতিমা, সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেও শুরু করে। অমনি তার ওপর বিষ নজর পড়তে শুরু করে বাড়ির অন্য সকলের। জামালের সব চিহ্নই মুছে গেছে, এখন জামালের বিধবাকে কে আর এখানে রাখতে চায়। একবার বিদায় হয়েছিল, আপদ গিয়েছিল, আবার কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো ! সঙ্গে আবার পুলিশ-মিলিটারি এনেছিল !

ফতিমার ঘরটা দখল করে নিয়েছিল জামালের ছোট ভাই সেন্টু, আবার ঘর-ছাড়া হয়ে তার রাগটাই বেশি। সে তার বড় ভাই ও ভাবীদের কাছে গজগজ করে, এই নষ্ট মেয়ে মানুষটাকে বাড়িতে স্থান দেবার কী দরকার, ও আমাদের কে ? ওর সঙ্গে এ পরিবারের আর তো কোনো সম্পর্ক থাকার কথা না !

মোল্লা সাহাবুদ্দিন অথর্ব হয়ে গেলেও এখনও তিনি পরিবারের প্রধান। বাড়ি ও জমি-জমার দলিল পত্র সব তাঁর সিন্দুকে। তাঁর মুখের ওপর কথা বলতে ছেলেরা ভয় পায়। তিনি এই পুত্রবধূটি সম্পর্কে এখনো স্নেহশীল, তিনি তাঁর

www.BanglaBook.org

দুর্বোধ্য ভাষায় প্রায়ই জানতে চান, ফতিমার কী হয়েছিল ? কে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়ায় ? কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে গোলামের ভয় হয়, পাড়া-প্রতিবেশীদের সামনে না বুড়ো এই সব কথা তুলে বসে ! কে কোনদিক দিয়ে ফোঁড়ন কাটবে, তার ঠিক নেই। গোলামের এক এক সময় ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা মেরে বুড়ো বাপটাকে ফেলে দেয় বাড়ির পাছ পুকুরে !

শরীর অনেকটা সুস্থ হলেও ফতিমার মাথাটা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। মাঝে মাঝে সে বাড়িটা চিনতে পারে না। এটা কার বাড়ি, ঐটা কার ঘর ? একে তাকে জিজ্ঞেস করে। রান্না ঘরের পাশের বাতাবি লেবুর গাছটা, পুকুরের ধারে বাঁশ ঝাড়, এই সবের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সবই যেন নতুন নতুন লাগে। কেউ তাকে মারছে না, কেউ তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে শরীর ছিঁড়ছে না, এতেও যেন সে অবাক হয়ে যায়।

পুকুর থেকে স্নান করে এসেছে ফতিমা. উঠোনের তারে শাড়ী মেলে দিচ্ছে, পিঠ ছেয়ে আছে বড় একটা মৌচাকের মতন ভিজে চুল, চোখ দুটো ছলছলে। উঠোন পার হতে গিয়ে গোলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার চোখ আটকে যায়। সে-ও যেন এক নতুন রমণীকে দেখছে। একে বাড়িতে রেখে দিলেই বা ক্ষতি কী ? ছোঁয়া-ছানি না করা গেলেও শুধু চোখে দেখতেই তো বেশ লাগে।

তখনই সে দেখতে পায় রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে তার বউ রেহানা। তার চোখে লক লক করছে রাগ।

গোলামের বুক কেঁপে ওঠে। রেহানার নজর থেকে রক্ষে নেই। ওদিকে গোলাম রাস্তায় বেরুতেই ভয় পায়, কারণ আড়কাঠিরাও তাকে তাকে আছে, তারাও ছাড়বে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলাম ভাবলো, নাঃ রেহানার বদলে আড়কাঠিদের হাতে ধরা দেওয়াই ভালো।

আড়কাঠিরাই তাকে ধরলো, দিন সাতেকের মধ্যে। তারা আর একদিনও সময় দিতে চায় না। গোলামের সঙ্গে তারা তিনজন মধ্য রাত্তিরে এসে দাঁড়ালো ঘুমন্ত ফতিমার বিছানার পাশে। ফতিমার মুখে সে-রকম কোনো ক্ষত নেই, পরিষ্কার মুখ, ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকে আছে, হয়তো সে কোনো স্বপ্ন দেখছে।

আড়কাঠিদেরও তো করে খেতে হবে। তারা মহাজনদের হয়ে কমিশনে কাজ করে। মহাজনরা ইন্ডিয়া থেকে গোরু আনায়, সেই টাকাটা শোধ দিতে হয় আরবে মেয়ে পাঠিয়ে। এক একটা মেয়ের দামে অন্তত দশটা গোরু আনা যায়।

www.BanglaBook.org

বাংলাদেশের কোনো এয়ারপোর্ট থেকে এখন আরবদেশে মেয়ে পাঠানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্ডিয়া থেকে পাঠানোই সুবিধে। তাও কলকাতার বদলে দিল্লি বম্বে থেকে প্লেনে চাপিয়ে দেওয়ার ঝামেলা অনেক কম। একবার এদিক থেকে বর্ডার পার করে দিতে পারলে, ওদিক থেকে ব্যবস্থা করার লোক থাকে।

আগেরবারের লোকটা নিমকহারামি করেছিল। সে ব্যাটা ফতিমাকে পার করাতে গিয়ে ভাবলো, আরবদের ভোগে লাগাবার আগে আমি একটু ভোগ করে নিই। তা একটু ভোগে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সে খুব বেশী বেশীই করে ফেলেছিল নিশ্চয়ই, মেয়েটা মরোমরো হয়ে যায়, তখন লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে ফতিমাকে ফেলে পালিয়ে আসে।

ফতিমা যদি সত্যি মরে যেত, তা হলেও গোলাম কাদের-রেহানার কোনো সমস্যা ছিল না। তখন আর আড়কাঠিরা টাকা ফেরৎ চাইতো না। কিন্তু প্রায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফতিমাকে ফিরিয়ে আনা হলো যে।

সত্যি, মানুষ শুধু বেঁচে থাকলেই যত সমস্যা!

এবার শুধু ফতিমা একা নয়, তার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে আছে, মুখ বেঁধে অমাবস্যার রাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের, ঐ একই বর্ডার দিয়ে পার করতে হবে, কারণ ওদিকে লোকজন ফিট করা আছে।

এবারেও নির্বিঘ্নে পার করা গেল না!

এক একটা রাতে পাহারা হঠাৎ জোরদার থাকে। বর্ডার গার্ডদের মাসে কয়েকটা কেস যে ধরে দিতেই হয় না হলে ওপরওয়ালা হুড়কো দেয়।

তিনটে মেয়েকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছিল দু'জন লোক, হঠাৎ তাদের সামনে যমদূতের মতন দু'জন সেপাই এসে হাজির হলো। একজন টর্চ, আর একজন রাইফেল উঁচিয়ে। আজ তারা যেন শিকার পাবার জন্য মরীয়া।

বিপদের সময় পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করে, এই নীতি মেনে কালোকারবারিরা একটি মেয়েকে গার্ডদের দিকে ঠেলে দিল খুব জোরে। সবাই জানে, মেয়েদের ওপর চট করে কেউ গুলি চালায় না

সেই মেয়েটি ফতিমা! সে ধাক্কা খেয়ে সেপাই দু'জনের মাঝখানে গিয়ে পড়লো। ততক্ষণে অন্যরা চম্পট দিয়েছে।

বাংলাদেশী সেপাই দুটির নাম দেওয়া যেতে পারে সুমতি আর কুমতি।

ফতিমাকে দেখে তাদের একজন বলতে চাইলো, ডিউটির গুলি মারো শালা!

www.BanglaBook.org

এমন বর্ষার রাতে এমন এক সুন্দর রক্তমাংসের ঢেলা পেয়েছি, একে দলাই মলাই করা যাক।

আর একজন বললো, ওরে নারে, আজ ক্যাপটেন কামাল সাহেব নিজে নাইট ডিউটিতে আছেন, চল, তাঁর হাতে এটাকে তুলে দিই! তিনি খুশী হবেন!

অন্য জন বললো, শালা, আমাদের ভোগে না লাগিয়ে ক্যাপটেনকে দেবো? ঐ শুয়োরের বাচ্চা ক্যাপটেন তো তবু শহরে যায়, আমরা যেতে পারি?

দ্বিতীয়জন বললো, ওরে, আজ রাতে ক্যাপটেন মাল খেয়ে খেপে আছে। আজ কোনো কেস দিতে না পারলে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করবে!

প্রথম জন বললো, ধুৎ! ক্যাপটেনকে জ্যান্ত কেস দিতে হবে তার কী কথা আছে? কয়েকটা বস্তা পরে তুলে দিলেই হবে!

দ্বিতীয় জন বললো, না, না, আজ এসব না। আজ চল রে!

দু'জনে দু'রকম মত নিয়ে তর্কাতর্কি করার পর শেষ পর্যন্ত সুমতির জয় হলো, ওরা এই জ্যান্ত মালই ক্যাপটেনকে পৌঁছে দিতে চললো।

তা ফতিমাকে যেখানে ওরা ধরেছে সেখান থেকে ক্যাপটেনের কুঠী অনেকটা পথ। এতটা রাস্তা কি আর এমনি এমনি যাওয়া যায়!

সেইজন্য মুখ বাঁধা ফতিমাকে চলতে চলতে একবার প্রথম সেপাই কামড়াতে লাগলো, একবার দ্বিতীয় সেপাই। এ ওর কোল থেকে কেড়ে নেয়। ফতিমার চিৎকার করবারও উপায় নেই। এইজন্যই ওদের পৌঁছোতে বেশ দেরি হলো। ফতিমা আবার রক্তাক্ত।

পুরো প্রস্থ পোশাক পরে ক্যাপটনে গিয়াস কামাল বসে আছে নিজের টেবিলে। তার আজকের হুইস্কির কোটা শেষ হয়ে গেছে, এবার সে নিজেই টহল দিতে বেরুবে।

সেপাইরা ফতিমাকে নিয়ে আসার পর হ্যাজাকের আলোয় সেই রমণীর মুখ দেখে সে মহাবিস্ময়ে বলে উঠলো, তুমি?

তার মুখ ফুটে উঠলো বেদনার ছায়া। কিছুতেই কি কোনো কাহিনী মিলনান্তক হতে পারে না? সাধারণ গার্হস্থ্য সুখও এত দুর্লভ বস্তু? ইনসাল্লা, একে আবার এর সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

সে হুকুম দিল, এই, মুখের বাঁধন খুলে দে!

তারপর সে খুবই আন্তরিক সমবেদনার সঙ্গে বললো, আবার তুমি কী করে এখানে এলে, ফতিমা? তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা…

www.BanglaBook.org

ফতিমার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। সে শারীরিক যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। সে তীব্র গলায় বললো, আমার নাম বীণা ! আমার বাবার নাম মণীন্দ্র সাহা ! তুমি কে ! এইডা কোন দ্যাশ ?

গিয়াস কামাল অনুতপ্ত ভাবে বললো, আমি আল্লার নামে শপথ করেছিলাম···

বীণা বাদুড়ের মতন তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, হায় আল্লা ! আমার কোনো বাড়ি নাই !

তারপরই সে একখানা ছুট দিল। তার শরীরে যেন নতুন শক্তি এসেছে, পায়ে এসেছে হরিণীর গতি।

সে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

কেঁপে উঠলো গিয়াস কামাল। মেয়েটা ইন্ডিয়ার বর্ডারের দিকে চলে যাচ্ছে। একটাই চিন্তা তাকে বিদ্ধ করলো। মেয়েটা যদি ওপারে পৌঁছে যায় কোনোক্রমে, তা হলে পরমজিৎ সিং-এর কাছে গিয়াস কামালকে অপদস্থ হতে হবে। পরমজিৎ সিং বিদ্রূপ করে বলবে, খুব যে আশ্রয় দেবে বলেছিলে ! আবার সেই মেয়েটাকে ঠেলে দিলে ইন্ডিয়ায় ?

গিয়াস কামাল সেপাই দুটোকে হুকুম দিল, ধর, ধর, যে কোনো উপায়ে মেয়েটারে ধর।

নিজেও সে ছুটলো। সেপাই দু'জন টর্চ জ্বেলেছে, সে হুইশ্‌ল বাজাতে লাগলো। বর্ডারের দিকে এমনি এমনি ছুটে যাওয়া বিপজ্জনক। হুইশ্‌ল শুনে ইন্ডিয়ান সাইড বুঝবে যে যারা আসছে, তারা স্মাগলার নয়। সরকারি লোক।

জোরালো টর্চের আলোয় সাদা মূর্তির মতন একবার দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে, আবার সে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আকাশে মেঘ গুমগুম করে কিছুই যায় না চেনা
কোন দিকে যে যায় সে কইন্যা নিজেই তা জানে না
আহা কিছুই যায় না চেনা
কেউ জানে না কী নাম তাহার বীণা না ফতিমা
একই অঙ্গে দুইখান প্রাণী, মধ্যখানে সীমা
আহা বীণা না ফতিমা
নামের মধ্যেই ধম্মো কম্মো প্রাণ বোঝে না কেউ
প্রাণের মধ্যেই সমুদ্দুর ভাই নামে বালির ঢেউ

www.BanglaBook.org

আহা প্রাণ বোঝে না কেউ
ঘর নাই তাহার ঘরণী সে, নাই তার জাতি কুল
বাঁচার চিন্তা বড় চিন্তা তবু হয় সব ভুল
আহা নাই তার জাতি কুল
অবলা সেই রমণীর কথা বলবো সবিস্তার
তারে খোঁজে সেপাই শান্ত্রী, বন্দুক-তলোয়ার
আহা বলবো সবিস্তার…

তারপর কী হলো ?

গিয়াস কামাল বলেছিল, যে-কোনো উপায়ে মেয়েটিকে ধরতে। মেয়েটি যখন সীমান্তের কাছে পৌঁছে গেছে, তখন এগিয়ে যাওয়া সেপাইটি ভাবলো, তাহলে জীবন্ত না পারি মৃতই ধরি !

সে পিস্তল তুলতেই কোনো ক্রমে গিয়াস কামাল কী করিস, কী করিস বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার হাতের ওপর। তবু গুলি ছুটে গেল। সে গুলি পলায়নপরা রমণীর মূর্তির গায়ে লাগলো কি না লাগলো, তা বোঝা গেল না ! নিশীথের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল !

হুইশ্‌লের শব্দ, রিভলভারের শব্দ, সেপাইদের চ্যাঁচামেচি, এইসব শুনেই আকৃষ্ট হলো ভারতীয় দিকের বর্ডার গার্ডরা। তারাও ছুটে এলো, একেবারে সামনে সামনে এলো ক্যাপটেন পরমজিৎ সিং।

দুই পক্ষের টর্চের জোরালো আলোয় দেখা গেল মাটির ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক রমণীমূর্তি।

পরমজিৎ আর গিয়াস কামাল পরস্পরকে স্যালুট করলো আগে, বন্ধুভাবে করমর্দন করলো, তারপর শুরু হলো কথার যুদ্ধ।

পরমজিৎ সিং বললো, তা হলে এই ব্যাপার আবার শুরু করেছেন। এই সব কেস ঠেলে দিচ্ছেন ইন্ডিয়ার দিকে ?

গিয়াস কামাল বললো, ক্যাপটেন সিং, এইসব উপদ্রব কি দু'একদিনে বন্ধ করা যায় ? দেখুন, আমি নিজে ছুটে এসেছি ওকে নিয়ে যেতে।

পরমজিৎ সিং বললো, ক্যাপটেন কামাল, আর ওকে নিয়ে কী করবেন। ওতো মরে গেছে। একটা মুর্দা। আপনারা ওকে গুলি করে মারলেন ?

—মোটেই ওর গায়ে গুলি লাগেনি, শুধু থামাবার জন্য ভয় দেখানো

www.BanglaBook.org

হয়েছিল। ও মরেনি।

—আর ওকে কোনোদিন ভয় দেখাবার দরকার হবে না ! দেখুন আর নড়ছে চড়ছে না।

—অজ্ঞান হয়ে গেছে। এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

—আমি আর্মির লোক, ডেড বডি দেখলেই বুঝতে পারি, কামালসাব !

—আমিও আর্মির লোক। ডেড বডি আমিও কম দেখিনি। আমি নিশ্চিত যে

দুই ক্যাপটেন হাঁটু গেড়ে বসলো। মেয়েটিকে চিৎ করালো। নাকের কাছে আঙুল রাখলো। দু'জনে দুটো হাত নিয়ে নাড়ি দেখবার চেষ্টা করলো। সেই মেয়ের শরীরে আর আলো-বাতাস নেই, শব্দ নেই।

দু'জনেই ফেলে দিল দুই হাত।

গিয়াস কামাল বললো, গুলি লাগেনি। ভয়ের চোটে আর দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতনে

পরমজিৎ বললো, মৃত্যু হয়েছে সেটা তো ঠিক ? এবার মানলেন তো ? জিন্দাল এই মুর্দা উঠাও !

কামাল বললো, একে আমি নিয়ে যাবো। যারা কালপ্রিট তাদের আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

—আপনার কালপ্রিটদের কথা আপনি বুঝুন। এই ডেড বডি আমি নিয়ে যাবো, আমার গভর্নমেন্টের কাছে এইসব ঘটনা রিপোর্ট করতে হবে।

—যত ইচ্ছে রিপোর্ট করুন। কিন্তু এই ডেড বডি আমি ছাড়বো না। এই দেখুন, এর শরীরের অংশ, আমাদের সাইডেই বেশিটা পড়ে আছে।

—মাথাটা পড়েছে আমাদের দিকে। মাথাটাই আসল। জিন্দাল, আও হাত লাগাও।

—রাখুন ! কেন ঝামেলা করতে চাইছেন। ওরে কে আছিস, এই বডিটা তুলে নে

—ঝামেলা আপনিই বাড়াচ্ছেন। জিন্দাল

—ক্যাপটেন সিং। এ মেয়ে মুসলমান। এর দাফনের ব্যবস্থা আমরা করবো

—আপনি সেদিন বলেছিলেন পাগলের কোনো জাত হয় না। মুর্দার বুঝি জাত থাকে ?

—এই সময় এই সব তর্ক তোলা কি ঠিক হচ্ছে ? আমরা যখন নিজে থেকেই

www.BanglaBook.org

এর শেষ কাজের দায়িত্ব নিচ্ছি···

—কেন, ইন্ডিয়ায় বুঝি মুসলমান মতে শেষ কাজ করা যায় না ?

—খবর্দার, এর গায়ে হাত ছোঁয়াবে না

—খবর্দার

তারপর কী হলো ?

দুই ক্যাপটেন যখন চুলোচুলি করতে যাচ্ছে, সেই সময় ওদের চোখের সামনে এক অপূর্ব, সুন্দর, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটলো।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সেই মেয়ে। তার শাড়ীতে কোনো রক্ত নেই, দেহে একটুও আঘাতের চিহ্ন নেই। বরং তার শরীর থেকে আলো বেরুতে লাগলো। ঝলকে ঝলকে বিদ্যুতের মতন আলো।

সে তো আসলে বীণা কিংবা ফতিমা নয়। সে যে জোছ্ছনাকুমারী !

তার শরীর মায়া দিয়ে গড়া। তাকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারে না। সে মাঝে মাঝে মানুষের মধ্যে নেমে আসে, মানুষের স্নেহ-মমতা-দয়া-ভালোবাসা পরীক্ষা করতে। সে প্রত্যেকবার দুই চোখে অশ্রু নিয়ে ফিরে যায়।

কালো কেশে বিজলি খেলে চক্ষে ঝরে পানি
কার ঘরণী কার বা কইন্যা কিছুই না তার জানি
আহা চক্ষে ঝরে পানি···

একবার সে পরমজিতের দিকে চাইলো, আরেকবার গিয়াস কামালের দিকে। একবার সে এই দেশ দেখলো, আর একবার ঐ দেশ। তার দুটি চক্ষু দিয়ে নেমে এলো গলানো রূপোর স্রোত।

মাটি থেকে উঁচুতে উঠে গেল সে। দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো, সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল আলো। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, তোমরা কেউ আমারে পাবে না। কেউ আমারে পাবে না !

তারপর আকাশের পরীর মতন, আশমানের হুরীর মতন সে মিলিয়ে গেল শূন্যে।

হ্যাঁ, সকলের চোখের সামনে। কত লোক তাকে দেখলো, কিন্তু কারুর মুখ দিয়ে আর একটাও কথা সরলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

হেকিমপুরের গ্রাম্য যাত্রা আর পালাগানের মেলায় শেষপর্যন্ত হাজির হলো ত্রিলোচন আর বাবাজী। ব্রজেন মাস্টার তাদের একপ্রকার জোর করেই ধরে এনেছে।

বাঁশ আর চট দিয়ে ম্যারাপ আর মঞ্চ বানানো হয়েছে মেলার এক ধারে। একজন মন্ত্রী উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েই চলে গেলেন, অনুষ্ঠান শোনার তাঁর সময় নেই। একদল কৌতূহলী লোক মন্ত্রীমশাই আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের গাড়ির পেছনে এমনি এমনি ছুটে গেল। মাইকে আবার লোকজন জড়ো করার জন্য হাঁকাহাকি চলতে লাগলো কিছুক্ষণ।

অন্যদিকে আবার একটা দোকান থেকে মাইকে সিনেমার গান বাজাচ্ছে। ভলান্টিয়াররা দৌড়ে থামাতে গেল তাদের। ঐ মাইক চললে এদিকের কিছু আর শোনা যাবে না। এতদিন পর আসল গ্রামীণ অষ্টক-সারি-জারি-বোলান যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই সবের মধ্যে আবার সিনেমার গানের উৎপাত। ঐসব সিনেমার গান তো সারা বছর শোনা যাবেই, অন্তত একটা দিন গ্রামের কথা মন দিয়ে শোন!

দোকানদারদের সঙ্গে খানিকটা বচসা হয়ে গেল ভলান্টিয়ারদের!

তারপর আবার অনুষ্ঠান শুরু হলো কোনোক্রমে। সামনের দিকে চাটাই দখল করে আছে এক গাদা বাচ্চা, তারা প্রচণ্ড চ্যাঁ ভ্যাঁ করছে, কিছু শোনার জো নেই, তাদের থামানোই যায় না। তারা যাত্রার নট-নটীদের সাজতে দেখে এসেছে উঁকি মেরে, সেই যাত্রা শুরু হবে অনেক রাতে, তার আগে বুড়ো ধুড়ো লোকদের গান শোনার ধৈর্য নেই তাদের।

পেছন দিকের চেয়ারে বসে আছে কাছাকাছি কয়েকখানা গ্রামের শ দেড়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি, সকলেই প্রায় বুড়ো। যুবকের দল উদ্যোক্তা, তারা শ্রোতা নয়। তারা দূরে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের চা খায়।

প্রথমে তিন চারজন লোক্যাল আর্টিস্ট। পল্লীগীতি, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত। হ্যাঁ, আজকাল নজরুলের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পল্লীগীতি,গাইবার ধরন সব এক রকম।

তারপর মঞ্চে এলো ত্রিলোচন আর বাবাজী।

ঘোষক মাইকের গলা চেপে হেঁকে বললো, এখন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে

www.BanglaBook.org

আসছেন, বিখ্যাত কবিয়াল মনোরঞ্জন সাঁতরা, না, দুঃখিত, বিখ্যাত কবিয়াল মনোহর সাঁতরার সুযোগ্য পুত্র ত্রিলোচন সাঁতরা এবং এবং ··· এই, এই, আর একজনের নাম কী, লেখাটা পড়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ, এবং বাবাজী প্রাণকৃষ্ণ গোঁসাই মহাশয়। এঁরা শোনাবেন জোছ্ছনাকুমারী পালা। হ্যাঁ, শুরু করুন, এই, ঐ দুটো মাইক অন করা আছে তো ?

বাবাজী নকল দাড়ি আর পরচুলা লাগিয়ে মুসলমান সেজেছে, আর ত্রিলোচনের কপালে ফোঁটা-তিলক কাটা, গায় একটা গামছা। ত্রিলোচন নিয়েছে খোল, বাবাজীর হাতে করতাল। দর্শকদের আসন থেকে জ্যামনি আর বিষ্টু উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে।

প্রথমে তারা মা সরস্বতী এবং গুরুবন্দনা দিয়ে শুরু করলো।

উইংসের পাশ থেকে কেতু তাড়া দিল, এই, এই, ঐটা সংক্ষেপ কর। টাইম বেশি নাই, মাত্র পনেরো মিনিট কিন্তু

গান বাবাজীই গাইছে, ত্রিলোচন ধুয়ো ধরছে শুধু।

শোনেন শোনেন বাবুগণ শোনেন দিয়া মন
আমাদের গড়বন্দীপুরের যতেক বিবরণ

আহা শোনেন দিয়া মন···

বটবৃক্ষের তলে একদিন ফুটিল জোছ্ছনা
রাত্তির নয়, অন্ধার নয়, দিনের মুছছনা
আহা ফুটিল জোছ্ছনা···

একটু পরেই হঠাৎ থেমে গেল বাবাজী। চুপ করে চেয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল করে। চোখ দিয়ে তার জল গড়াচ্ছে। শুধু পালা বাঁধলে আর গাইতে জানলেই কি হয়, মঞ্চে গান গাইতে গেলে আলাদা কায়দা শিখতে হয়। মঞ্চে সত্যি সত্যি কেউ কাঁদে না, কান্নার নকল করতে হয়, সেটাই বাবাজী জানে না। ত্রিলোচন অবাক ভাবে বাবাজীর দিকে চেয়ে খোলটা বাজিয়েই চলেছে, সে ভাবছে ঠিক তালের জায়গায় বাবাজী আবার ধরবে। সে নিজে একা চালিয়ে যেতে পারবে না। তার সব পদ মনে নেই।

বাবাজী তবু চুপ।

ক্রমে দুই উইংসের পাশ থেকে ফিসফাসের তাড়না আর শ্রোতাদের মধ্য থেকে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

তবু আর গাইতে পারলো না বাবাজী, চোখের জলে তার গলা বুজে গেছে যে !

দূরে, দর্শকদের সারি যেখানে শেষ হয়ে গেছে, যেখানে অন্ধকার, সেইখানে একা দাঁড়িয়ে আছে কে, এক রমণীমূর্তি না ? ও কে ? ও কে ? আবার কি এসেছে জ্যোছ্নাকুমারী ? ঝাপসা চোখে সেদিকে তাকিয়ে বাবাজীর বুক থরথর করে। তার মনে পড়ে, জোছ্নাকুমারী একবারই তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিল। শিমুলগাছতলার পাশ দিয়ে নেমে সীমান্তের কাছে যাবার সময় দুশমনরা এসে যখন তাদের ধরলে, তখন জোছ্নাকুমারী বলে উঠেছিল, আমি তোমার সঙ্গে যাবো ! হায়, এমনই অপদার্থ মানুষ সে,তবু সে জোছ্নাকুমারীকে নিজের করে রাখতে পারলো না।

দু'তিনবার কনুইয়ের খোঁচা দিয়েও সাড়া না পেয়ে ত্রিলোচন খোল বাজানো বন্ধ করে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবলো, গান-ফান আর তাদের দ্বারা হবে না। কেন গরিবের এইসব ঘোড়া রোগ !

দর্শকদের মধ্য থেকে সিটি, বেড়াল ডাক আর হাসাহাসি প্রবল হচ্ছে। উইংসের পাশ থেকে উদ্যোক্তারা বলছে, ড্রপ সিন, ড্রপ সিন ফেলে দে।

ত্রিলোচন বাবাজীর হাত ধরে টানলো।

বাবাজী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। এখনো সে দেখতে পাচ্ছে সেই রমণী মূর্তিকে। তার সারা গায়ে আলো, দু' চোখে জল। গান আর আসছে না, সে জোছনাকুমারীকে ধরার জন্য দু'হাত তুলে ঝাঁপ দিল। আর কিছু না, সে চায়, এখান থেকে অনেক দূরে গিয়ে, নিরালায়, আকাশী বটগাছতলায় সে জোছনাকুমারীকে পুরো গানটি নিবেদন করবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG